প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : জুন, 2014

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সহায়ক পাঠ) : তৃতীয় পত্র : স্নাতকস্তর

Political Science (Subsidiary) : Third Paper [SPS - III] : Bachelor Degree Programme [BDP]

[ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি]

(Government and Politics in India)

পাঠক্রম

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় (Module) : 01		
একক 01-04	অধ্যাপক শ্যামলেশ দাশ	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র রায়
পর্যায় (Module) : 02		
একক 05-06	অধ্যাপিকা শান্তি মুখার্জী	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র রায়
একক 07-08	অধ্যাপক নিতাই চক্রবর্তী	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র রায়
পর্যায় (Module) : 03		
একক 09-12	অধ্যাপক তথাগত চক্রবর্তী	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র রায়
পর্যায় (Module) : 04		
একক 13-16	ড. রাজশ্রী বসু	ড. অরুণাভ ঘোষ অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র রায়

পরিমার্জন, বিন্যাস ও সম্পাদনা

ড. দেবনারায়ণ মোদক

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও অধিকর্তা, স্কুল অব হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেস,

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : সহায়ক পাঠ : তৃতীয় পত্র

[SPS—III]

(স্নাতক পাঠক্রম)

[ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি]

(Government and Politics in India)

[২০১২ জুলাই এবং তৎপরবর্তী শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য]

পর্যায় 01

একক 01 ❑ ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯১৯) 7

একক 02 ❑ ১৯১৯ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ 14

একক 03 ❑ ভারতের সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদ 21

একক 04 ❑ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা 29

পর্যায় 02

একক 05 ❑ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ 36

একক 06 ❑ ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন বিভাগ 62

একক 07 ❑ ভারতীয় ইউনিয়নের আইন বিভাগ 84

একক 08 ❑ ভারতের বিচার ব্যবস্থা 110

পর্যায় 03

একক 09 ❑ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা : কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক 123

একক 10 ❑ রাজ্যের শাসন বিভাগ 138

একক 11 ❑ রাজ্যের আইনসভা 152
একক 12 ❑ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি 167

পর্যায় 04

একক 13 ❑ ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন 173
একক 14 ❑ ভারতের রাজনৈতিক দল 180
একক 15 ❑ আঞ্চলিকতাবাদ 189
একক 16 ❑ জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা 206

একক ০১ ☐ ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯১৯)

গঠন

০১.১ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা
০১.২ ১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী অবস্থা
০১.৩ ১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রণকারী আইন
০১.৪ উইলিয়ম পিটের ভারত শাসন আইন
০১.৫ ভারত শাসন আইন ১৮৫৮
০১.৬ ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৬১
০১.৭ ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৯২
০১.৮ মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন ১৯০৯
০১.৯ সারাংশ
০১.১০ অনুশীলনী
০১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

০১.১ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আমরা ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে পারি। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

০১.২ ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশ ১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী অবস্থা

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এবং ১৭৬৪ সালে বক্সার যুদ্ধে জয়লাভের পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বণিক পুঁজির অনুপ্রবেশ সুনিশ্চিত হয়। যুদ্ধের পরিণতি স্বরূপ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করার পর ব্রিটিশ বণিক পুঁজির প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে বণিক পুঁজির সঙ্গে শিল্প পুঁজির বিরোধ বাধে। পার্লামেন্টে শিল্প পুঁজির প্রতিনিধিরা প্রাধান্য অর্জন করায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যথেচ্ছভাবে ভারতকে শাসন ও শোষণ করে। কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন ক্ষমতা পার্লামেন্টের ছিল না। কেবলমাত্র মালিকদের সভা (Court of Proprietors) এবং পরিচালকমণ্ডলীর সভা (Court of Directors) দ্বারা কোম্পানির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শিল্পপুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির

কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের দাবি উঠতে থাকে। বার্ক, ফক্স, শেরিডন প্রমুখ শিল্প পুঁজির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং এডাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রবক্তাগণ কোম্পানির শাসনের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই গ্রেট ব্রিটেনে ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষেত্রে সংস্কারের সূচনা হয়।

০১.৩ ১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রণকারী আইন

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইন প্রণীত হয়। এই আইন নিয়ন্ত্রণকারী আইন বা রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) নামে পরিচিত। এই আইন প্রণীত হওয়ায় পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে যুদ্ধের দ্বারা বা বিদেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানি যে সব ভূখণ্ড অধিকার করেছে সেগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। লর্ড নর্থ প্রণীত এই নিয়ন্ত্রণ আইন বা রেগুলেটিং অ্যাক্টের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে এই আইনে বাংলা প্রেসিডেন্সির সর্বোচ্চ শাসনকর্তাকে গভর্নর জেনারেল বা বড়লাট আখ্যা দেওয়া হয়। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য গভর্নর জেনারেলের পরিষদে (Council) চারজন সদস্যকে পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতানুযায়ী গভর্নর জেনারেল কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবেন বলে ওই আইনে বলা হয়। নিয়ন্ত্রণ আইনের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও ছিল। এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পার্লামেন্ট ব্রিটিশরাজ, কোম্পানির পরিচালকসভা ও ভারতীয় প্রশাসনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার পরিধি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে মত বিরোধ শাসনকার্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। আইনে বলা হয়েছে যে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হবে। কিন্তু এখানেও দেখা গেল যে পরিষদের তিনজন সদস্য একজোট হয়ে গভর্নরের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং শাসনকার্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে।

০১.৪ ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত শাসন আইন

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্টের ত্রুটি দূর করার জন্য ১৭৮১ সালে বিচারবিভাগীয় এলাকা সংক্রান্ত আইন (Judicature Act) প্রণীত হয়। রেগুলেটিং অ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রণকারী আইনে সুপ্রিমকোর্টের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এই আইনের ফলে সেগুলি বাতিল হয়। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণকারী আইনের অন্য ত্রুটি বিচ্যুতি দর করার জন্য হুইগ নেতা চার্লস্ জেমস্ ফক্স ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল আনয়ন করেন। কিন্তু লর্ড সভায় বিলটি অগ্রাহ্য হলে লর্ড নর্থ ও ফক্সের কোয়ালিশন সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। সেই সময় ইংল্যান্ডের জনমত ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পিট নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার পরেই ১৭৮৪ সালে ফক্সের ভারত শাসন আইনের অনুরূপ একটি আইন প্রণীত হয়। এই আইনটির নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইন ১৭৮৪। সাধারণভাবে এটি

পিটের ভারত শাসন আইন ১৭৮৪ (Pitt's India Act) নামে বিখ্যাত। পিটের ভারতশাসন আইনকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের দ্বিতীয় সুদূর পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এই আইনের মাধ্যমে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী সমগ্র ভূখণ্ডকে সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চল (British possession in India) বলে ঘোষণা করা হয়।

পিটের ভারতশাসন আইন কার্যত ইংল্যান্ড থেকে কোম্পানির কার্যাবলীর উপর দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। তাছাড়া এই আইন ভারতের গভর্নর জেনারেলকে অন্যান্য প্রেসিডেন্সির উপর প্রাধান্য দিয়ে কার্যত ভারতবর্ষের ঐক্য সাধনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল।

০১.৫ ভারত শাসন আইন ১৮৫৮

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে ইংল্যান্ডের শাসকগোষ্ঠী দমন করতে সক্ষম হলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শিল্প পুঁজিপতিরা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে অর্থাৎ ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের বাজার রূপে দখল করার জন্য আগে থেকেই কোম্পানির উপর একের পর এক বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে কোম্পানির যে কোনও যোগাযোগ নেই এই বিদ্রোহ থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই তারা জনসংযোগহীন ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বহীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে ভারতবর্ষের মত বহুজাতি বিশিষ্ট একটি বৃহৎ দেশের শাসন ক্ষমতা রাখার বিরুদ্ধে তীব্র মত পোষণ করেন। তারা ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান দাবি করেন। এর ফলে ১৮৫৮ সালে লর্ড পামারস্টোন ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল পেশ করেন। অনেক বিরোধিতার পরে শেষ পর্যন্ত বিলটি আইনে পরিণত হয়। এই আইন ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত হয়।

এই আইনের মূলকথা হল ভারত শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজের হাতে হস্তান্তরিত হল। ব্রিটেনের সম্রাট কোম্পানির স্থল ও নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিকর্তা হলেন। পুরাতন নিয়ন্ত্রণকারী পর্ষদকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হল। ভারতের শাসনভার একজন ভারত সচিব ও তার ভারত শাসন পরিষদের হাতে অর্পণ করা হল। ভারত শাসন ব্যাপারে ভারত সচিবকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল করে রাখা হল।

এইভাবে ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ব্রিটেনের শিল্পপতিরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশরাজের অধীনে আনতে সমর্থ হয়। এর ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির শোষণের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তাঁরা ভারতবর্ষে সুশাসন প্রবর্তনের নামে কার্যত ভারতকে ব্রিটেনের শিল্প সমূহের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে রূপান্তরিত করেন।

০১.৬ ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন ১৮৬১

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারানির ঘোষণায় (Royal Proclamation) উত্তরোত্তর ভারতীয়দের শাসনকার্যে সংযুক্ত করার যে কথা বলা হয়েছিল কয়েকটি ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন পাশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সে বিষয়ে কিছুটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ওই বিষয়ে প্রথমেই ১৮৬১ সালে প্রণীত ভারতীয় পরিষদ আইনের (The Indian Council Act) কথা উল্লেখ করা যায়। ওই আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল — ১৮৩৩ সালের সনদে প্রদেশগুলির যে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ১৮৬১ সালে প্রণীত আইনে মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ের সপারিষদ গভর্নরদের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পুনরায় সেই সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গভর্নর জেনারেলের হাতে নিয়মকানুন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

তাছাড়া জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য গভর্নর জেনারেলকে 'অর্ডিন্যান্স' জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয়কে যুক্ত করা হলেও কার্যক্ষেত্রে বেসরকারি ভারতীয় সদস্যরা আইন প্রণয়ণের ব্যাপারে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেননি। কারণ বড়লাট কিম্বা প্রাদেশিক গভর্নরগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহের উপর আলোচনা করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা তাদের ছিল না। তারা ওইসব আইনের প্রস্তাব বাতিল করতে পারতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ওইসব আইনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে এই আইনকে অন্যতম পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

১৮৮৩ সালের আইনে ভারতবর্ষে যে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, বর্তমান আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সীমাবদ্ধভাবে হলেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ফলে পূর্বনীতির পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়ত, উক্ত আইন প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার পার্থক্য নিরূপণ করে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সূত্রপাত ঘটায়।

০১.৭ ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন ১৮৯২

আগেই বলা হয়েছে ভারতে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৮৮৩ সালে পার্লামেন্টে যে আইন প্রণীত হয়েছিল তাতে শাসনপরিবদকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অর্পণ করা হয়। ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল যে এই আইনে গভর্নর জেনারেলের পরিষদে অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলা হয়। স্থির হয় যে পরিষদে ১৬ জন সদস্য থাকবে না তার মধ্যে দশজন হবেন বেসরকারি সদস্য। আবার দশজন সদস্যের মধ্যে প্রাদেশিক সরকারগুলির বেসরকারি সদস্যগণ কর্তৃক চার জন এবং বণিক সভাগুলির দ্বারা একজন নির্বাচিত হবেন। গভর্নর জেনারেলের নিকট ওইসব প্রতিনিধির নাম সুপারিশ করার পর তিনি তাদের পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারেন। কেন্দ্রের মত প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে এক ধরনের পরোক্ষ

নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিক ও শিল্পপতিদের সভা ইত্যাদির সুপারিশক্রমে গভর্নররা নিজ নিজ প্রদেশের আইনসভার বেসরকারি সদস্যদের মনোনীত করবেন বলে ১৮৯২ সালের ভারতীয় আইন পরিষদ আইনে বলা হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়।

১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও কার্যত তাদের হাতে কোন ক্ষমতাই অর্পণ করা হয়নি। তাছাড়া গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরদের মনোমত না হলে কোনও ভারতীয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে স্থান পেতে পারেন না।

০১.৮ মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন ১৯০৯

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সারা দেশে বিশেষ করে 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের ঝড় শুরু হয় তা প্রশমিত করার জন্য ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন করেন। তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড মর্লি ও ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর উদ্যোগে এই আইন প্রণীত হয়েছিল বলে সাধারণভাবে তা 'মর্লি' মিন্টো সংস্কার আইন বা (Morley Minto Reforms Act) নামে সুপরিচিত। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্য সংখ্যা ষোলজন থেকে বাড়িয়ে ষাট জন করা হয়। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইনপরিষদের সদস্য সংখ্যা কুড়ি থেকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ করা হয়। অন্যান্য প্রদেশে এই সদস্য সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ত্রিশে দাঁড়ায়।

মর্লি মিন্টো সংস্কার আইনে এ দেশে সর্বপ্রথম নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করা হয়। সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও ঘোষণা করা হয়। সেজন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা (Separate Electorate System) চালু করা হয়। আইন সভাগুলির ক্ষমতাও কিছুটা পরিমাণে বাড়ানো হয়।

১৯০৯ সালের ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন বা মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন আপাতদৃষ্টিতে শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের পরিধি বাড়ালেও কার্যত একান্ত ব্রিটিশভক্ত নরমপন্থীরাই এই সুযোগ লাভ করতেন। চরমপন্থী ও বিপ্লবীদের সুকৌশলে এই সুযোগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের চিরাচরিত রীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তথাকথিত সংস্কার সাধনের নামে এই আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে। লর্ড মিন্টো দ্বিজাতি তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও পৃথক ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। এইভাবে মর্লি মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয় তা কালক্রমে মহীরুহের আকার ধারণ করে ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দেয় এবং পরিণামে ভারতবিভাগের পথ প্রশস্ত করে।

০১.৯ সারাংশ

ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তাঁদের রাজনৈতিক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বণিক পুঁজির ওপর শিল্প পুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে।

এই পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা হয় যেখানে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে 'গভর্নর জেনারেল'-এর পদ সৃষ্টি করা হয়, এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি পরিষদ গঠন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু নানা কারণে এই আইন প্রশাসনিক কার্যকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে পারেনি।

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য ১৭৮১ সালে 'বিচার-বিভাগীয় এলাকা সংক্রান্ত আইন' প্রণীত হলেও এই আইনের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। 'পিটের ভারত শাসন আইন (১৭৮৪)' কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীনে সমস্ত ভূখণ্ডকে সর্বপ্রথম ভারতে ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে এবং কোম্পানির কার্যাবলীর ওপর ইংল্যান্ড থেকে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছিল।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৮৫৮ সালে প্রণীত 'ভারত শাসন আইন'-এ কোম্পানির হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের হাতে তুলে দেওয়া হল এবং ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হল একজন ভারতসচিব এবং তার ভারত শাসন পরিষদের হাতে।

১৮৬১ সালে প্রণীত 'ভারতীয় পরিষদ আইন'-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয়কে সংযুক্ত করা হলেও কার্যক্ষেত্রে বেসরকারি ভারতীয় সদস্যরা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেননি। তবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে এই আইনের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল ১৮৯২ সালের 'ভারতীয় পরিষদ আইন'-এ। কিন্তু বাস্তবে তাদের হাতে কোন ক্ষমতাই অর্পণ করা হয়নি। ১৯০৯ সালের 'মর্লি মিণ্টো সংস্কার আইন' ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সম্প্রদায়-ভিত্তিক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করে এবং পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা চালু করে। আপাতদৃষ্টিতে শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের পরিধি বাড়ালেও এই আইনের সুবিধা ভোগ করতেন ব্রিটিশভক্ত নরমপন্থীরা। তাছাড়াও এই আইন দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল।

০১.১০ অনুশীলনী

১। ১৮৫৭ সালের পূর্বে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবস্থা বর্ণনা করুন।

২। উইলিয়ম পিটের ভারতশাসন আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী ছিল?

৩। মহারানির ঘোষণা পত্রে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ক্ষোভ প্রশমনের জন্য কী কী ব্যবস্থা করা হয়েছিল?

৪। ১৮৬১ ও ১৮৯২ সালের সংস্কার আইনে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর অংশগ্রহণের সুযোগ কতটা সম্প্রসারিত হয়েছিল?

৫। ১৯১৯ সালের মর্লি মিন্টো সংস্কারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

০১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Introduction to the Constitution of India — *Dr. Durgadas Basu*, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi.

(২) ঐ—অনুবাদ ভারতের সংবিধান পরিচয় — *রমেন্দ্র মজুমদার*।

(৩) ভারতের শাসনব্যবস্থার পরিচয় — *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মল কান্তি ঘোষ*।

(৪) ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি — *অনাদিকুমার মহাপাত্র, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।*

একক ০২ ❐ ১৯১৯ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

গঠন

০২.১ উদ্দেশ্য
০২.২ প্রস্তাবনা
০২.৩ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি
০২.৪ ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
০২.৫ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি
০২.৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন
০২.৭ ১৯৪৬ সালের গণপরিষদের নির্বাচন
০২.৮ ক্ষমতা হস্তান্তর ও স্বাধীন ভারতের সূচনা (১৯৪৭)
০২.৯ সারাংশ
০২.১০ অনুশীলনী
০২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

০২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে কীভাবে ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড সংস্কার থেকে, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর, গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন এবং স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে সেই সাংবিধানিক ইতিহাসের এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবেন।

ভারতবর্ষে সাংবিধানিক শাসনের যে ঐতিহ্য প্রবর্তিত হয়েছে তার গোড়াপত্তন হয় ঔপনিবেশিক আমলের শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলির মধ্য দিয়ে। বস্তুত বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের বেশ কিছু উপাদানের ওপর ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের ছায়া পড়েছে অনেকটাই। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ অধ্যয়নে এই এককটি সহায়ক হবে।

০২.২ প্রস্তাবনা

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের জনগণকে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে সংযুক্ত করা এবং ভারতের দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই হল ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক লক্ষ্য। প্রস্তাবিত আইনের প্রবর্তন, প্রয়োগ ও ব্যর্থতা জনিত অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতরাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যায়। সেই অগ্রগমনের ফলশ্রুতি ১৯৩৫

সালের ভারতশাসন আইন ও ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভা সমূহের নির্বাচন; ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর ও স্বাধীনতার সূচনা, গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন ও ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ভারতের গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে।

০২.৩ ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের পটভূমি

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ রদ বলে ঘোষিত হলেও দেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এতে স্তিমিত হয়নি। সেই সঙ্গে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে থাকে। গান্ধিজি অবশ্য মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে সাহায্য করার আহ্বান জানান এবং পরোক্ষভাবে তাদের সাহায্য করেন। যুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্না, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। ওই স্মারকলিপিতে (Memorandum) তারা ১৯০৯ সালের সংস্কার আইনকে 'অসমাপ্ত' বলে বর্ণনা করেন। কারণ ওই আইনে ভারতীয়দের কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। তারা সু-সরকার (good government) কিংবা সুদক্ষ প্রশাসন চান না তা নয়। কিন্তু আবেদনকারীরা এমন একটি সরকার চান যে সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন। ওই একই বছরের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুক্তভাবে স্বায়ত্তশাসন মূলক রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি জানায়। এই দাবিটিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য সরকারের কাছে সংস্কার বিষয়ে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা (Scheme) পেশ করা হয়। এই সময় লর্ড মন্টেগু ভারতসচিব হন। তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন ১৯১৭ সালে। ১৯১৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভারতের ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভারতের জন্য একটি শাসন সংস্কার মূলক রিপোর্ট তৈরি করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন পাশ হয়।

০২.৪ ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পর ভারত সচিবের বেতন ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেওয়ার বদলে ব্রিটেনের রাজস্ব তহবিল থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের জন্য একজন হাইকমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই নতুন আইনে কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুটি কক্ষ হলো কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ (Central Legislative Assembly) এবং রাজ্য পরিষদ (Council of States)। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মেয়াদ হল তিন বছর। কিন্তু রাজ্য পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ হল পাঁচ বছর। কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের নির্বাচনের ব্যাপারে নাগরিক অধিকার কমিটি (Franchise Committee) পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির সুপারিশ করলেও সরকার উভয় কক্ষের জন্য

প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির প্রবর্তন করে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তিত হলেও সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিই ভোটাধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়। কারণ ভোটদাতাদের যোগ্যতার উপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় আইন সভার ক্ষমতা অনেক খর্ব করা হয়। ১৯১৯ সালের আইনে প্রথম ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনিক বিষয়গুলিকে দুটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা কেন্দ্রীয় তালিকা ও প্রাদেশিক তালিকা। প্রাদেশিক আইন সভাগুলির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়।

ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন (Provincial Dyarchy) প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা— সংরক্ষিত বিষয় (Reserved Subjects) এবং হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred Subjects)। হস্তান্তরিত বিষয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রীদের উপর থাকত। সংরক্ষিত বিষয়গুলির দেখাশোনা গভর্নর করতেন। গভর্নর নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে গণ্য হলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি প্রধান ও প্রকৃত শাসকে পরিণত হন। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীরা জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হতেন।

০২.৫ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি

১৯১৯ সালের মন্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের সংস্কার আইন প্রণীত হওয়ার পরেও সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীনিবাস আয়েংগার, জওহরলাল নেহরু প্রমুখের নেতৃত্বে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ভারতব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু করার জন্য 'স্বাধীনতা সংঘ' (Independence League) গঠন করেন। তাদের চেষ্টাতেই ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পর ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে গান্ধিজীর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পর পর এই সব নানা ঘটনা ঘটতে থাকায় ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ে। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ 'শ্বেতপত্র' (White Paper) নামে এক দলিলের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা (Dyarchy) এবং প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ওই শ্বেতপত্রের প্রস্তাব বিচার বিবেচনার জন্য একটি যৌথ মনোনয়ন কমিটি (Joint Select Committee) গঠিত হয়। ওই কমিটির সভাপতি ছিলেন লর্ড লিন্‌লিথগো। ওই কমিটি ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্বর তার রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর একটি বিল উত্থাপন করেন। ১৯৩৫ সালের ২রা আগস্ট ওই বিল ব্রিটিশ রাজার সম্মতি (Royal Consent) লাভের পর আইনে পরিণত হয়। ওই আইনই ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ (The Government of India Act 1935) নামে পরিচিত।

০২.৬ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব। এই আইন অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্য এই দুভাগে ভাগ করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে এগারোটি করা হয়। ব্রিটিশ ভারত বলে কথিত ওই ১১টি প্রদেশকে আবশ্যিকভাবে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। বলা হয় যে কোন দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যকে 'যোগদান সম্পর্কিত দলিল'-এ (Instrument of Accession) স্বাক্ষর করতে হবে। ওই দলিলে স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করার পর ওই রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় নীতি হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছিল। তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টি কেউই গ্রহণ করেনি।

০২.৭ ১৯৪৬ সালের গণপরিষদের নির্বাচন

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করেছেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে সারা দেশ জুড়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছে। ক্রিপ্‌স্ মিশন ভারতবর্ষে এসেছে। মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি করেছে। যুদ্ধান্তে ভারতের রাষ্ট্রিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ভারতবর্ষের রাজনীতি ও সাংবিধানিক বিকাশের ক্ষেত্রে এনেছে সুদূরপ্রসারী গুণগত পরিবর্তন।

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে গণপরিষদের প্রতিষ্ঠাকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেদিন থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে সেদিন থেকেই ভারতের সংবিধান রচনায় ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপিত হয়েছে। ১৯২২ সালে গান্ধিজি এই দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতবাসীর জন্য সংবিধান রচনার দাবি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেই সুস্পষ্টভাবে তোলা হয়। এদিকে আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যর্থতার পর ১৯৩৪ সালের মে মাসে কংগ্রেস নরমপন্থীরা (Moderates) আইন সভায় প্রবেশ করার কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধান রচনার দাবি জানায়। ১৯৩৬ সালের ২৯ শে জুলাই কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে গণপরিষদ গঠনের সপক্ষে জোরালো দাবি উত্থাপন করে।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে গণপরিষদ গঠনের দাবি জোরালো আকার ধারণ করলে ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট ভাইস্‌রয় তার বিখ্যাত আগস্ট ঘোষণায় (August Declaration) সর্বপ্রথম স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা একান্তভাবেই ভারতীয়দের নিজস্ব ব্যাপার।

এরপর ক্রিপস্ মিশন প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটার পর সর্বশ্রেণির ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। এর পর ১৯৪৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার একটি গণপরিষদ আহ্বান করবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। তিনি প্রস্তাবিত সংবিধান রচনার ব্যাপারে ভারতীয় ঐকমত্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভারতে আগত ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৪৬ সালে সারাভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মোট ১৮৮৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস একাই ৯২৫টি অর্থাৎ ৫৮% আসন অধিকার করে। এই নির্বাচনের পর ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ভারতের গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণপরিষদের মোট ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৩টি আসনে জয়লাভ করে। এছাড়া গণপরিষদে কংগ্রেস ৪ জন মুসলমান ও ১ জন শিখ প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে। ফলে গণপরিষদের মোট ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ২০৮ জন। এইভাবে গণপরিষদ কার্যত কংগ্রেস পরিষদে রূপান্তরিত হয়।

০২.৮ ক্ষমতা হস্তান্তর ও স্বাধীনতা লাভের সূচনা

ক্ষমতার হস্তান্তর ও 'ডোমিনিয়ন ভারত'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। এই অধিবেশনে ইউনিয়ন-এর ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটির (Union Powers Committee) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক ক্ষমতা বিষয়ক রিপোর্ট, সংখ্যালঘু পরামর্শদাতা কমিটির রিপোর্ট এবং সংবিধান রচনাকারী ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে গণপরিষদের ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শেষোক্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয় যে গণপরিষদ সংবিধান রচনা এবং আইন প্রণয়ন উভয় কার্যই করবে।

বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের জন্য একটি খসড়া সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্যে ২৯শে আগস্ট ১৯৪৭-এ একটি মুসাবিদা কমিটি (Drafting Committee) গঠিত হয়। ডঃ বি. আর আম্বেদকর ওই কমিটির সভাপতি হন। এই কমিটির আড়াই বছরের প্রচেষ্টার ফলে ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম, লিখিত গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান তৈরি হয়।

০২.৯ সারাংশ

ভারতবর্ষে শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ১৯১৯ সালের 'ভারত শাসন আইন' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই

আইন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছিল, যেমন — ভারত সচিবের বেতন ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেওয়ার পরিবর্তে ব্রিটিশের রাজস্ব তহবিল থেকে প্রদান, গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসাবে একজন হাইকমিশনার নিয়োগ, কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রশাসনিক বিষয়গুলিকে দুটি তালিকায় বিভক্তিকরণ ইত্যাদি।

কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন, গান্ধিজির নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীদের আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার 'শ্বেতপত্র' দলিলের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা এবং প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন যেটির বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব পড়ে একটি 'যৌথ মনোনয়ন কমিটি'-র ওপর। এই কমিটির রিপোর্টের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইন' প্রবর্তিত হয়। এই আইনে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বন্টন, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন প্রভৃতির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টি কেউই গ্রহণ করেনি।

গণপরিষদের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সংবিধান রচনায় ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট তৎকালীন ভাইসরয় তাঁর বিখ্যাত 'আগস্ট ঘোষণা'য় ভারতীয়দের নিজস্ব সংবিধান রচনার বিষয়টিকে সমর্থন জানান। এরপর ক্রিপস্ মিশন সুপারিশ, ওয়াভেল পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গণপরিষদ গঠিত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে বিভিন্ন কমিটি রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার ওপর ভিত্তি করে ভারতের জন্য একটি খসড়া সংবিধান তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় একটি কমিটির ওপর যার আড়াই বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম, লিখিত, গণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান তৈরি হয়।

০২.১০ অনুশীলনী

১। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের রাজনৈতিক পটভূমি কী ছিল?

২। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

৩। কী পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হয়েছিল তা আলোচনা করুন।

৪। ১৯৪৬ সালে ভারতে গণপরিষদ নির্বাচনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৫। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর ও স্বাধীন ভারতের সূচনা পর্বের উপর এক সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

০২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Social Background of Indian Nationalism - *A. R. Desai.*

(২) Introduction to the Constitution of India - *Dr. Durgadas Basu.*

(৩) ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি — *অনাদিকুমার মহাপাত্র, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।*

একক ০৩ ❐ ভারতে সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদ (Constituent Assembly)

গঠন

০৩.১ উদ্দেশ্য

০৩.২ প্রস্তাবনার ইতিবৃত্ত ও বৈশিষ্ট্য

০৩.৩ গণপরিষদে গণচরিত্রের অভাব

০৩.৪ সংবিধানের উপর কোন গণভোট দেওয়া হয়নি

০৩.৫ গণপরিষদের কাজে পদ্ধতিগত ত্রুটি

০৩.৬ সামাজিক বিপ্লবের অঙ্গীকারের স্বরূপ

০৩.৭ সারাংশ

০৩.৮ অনুশীলনী

০৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

০৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ভারতীয় সংবিধান রচনার আনুপূর্বিক ইতিহাস ছাত্রছাত্রীদের সামনে উন্মোচিত হবে।

ফলে ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা (Polity), তার উৎস, বিবর্তন ও ক্রমপরিণতি, তার ঘোষিত আদর্শ, আদর্শের স্বরূপ, যথার্থ সত্যতা এবং প্রায়োগিক সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি সুশৃঙ্খল, সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা মনের মধ্যে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এই ধারণা ভারতবর্ষে তাঁদের গণতান্ত্রিক নাগরিকতার (Democratic Citizenship) এক অনুকূল অনুষঙ্গ হবে।

০৩.২ প্রস্তাবনার ইতিবৃত্ত ও বৈশিষ্ট্য

ডঃ আম্বেদকরের সভাপতিত্বে গঠিত মুসাবিদা কমিটিকে (Drafting Committee) কতকগুলি বিষয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অনুসরণ করার জন্য গণপরিষদ নির্দেশ দেয়। ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এই কমিটি ভারতীয় গণপরিষদের (Constituent Assembly) সামনে ভাবী সংবিধানের এক খসড়া পেশ করে। সুদীর্ঘ আলোচনার পরে বেশ কয়েকটি ধারা সংশোধিত হবার পর ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ওই সংবিধান গণ পরিষদে গৃহীত হয়। এরপরে গণপরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ওই খসড়া

সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারি গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন বসে। ওই অধিবেশনে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে ভারতের নতুন সংবিধান কার্যকরী হয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিটি দেশের সংবিধানের একটি নিজস্ব দর্শন থাকে। একটি সংবিধানের দর্শন বলতে সাধারণত সেই সব আদর্শ (Ideals) বা নীতিসমূহ (Policy)-কে বোঝায় যেগুলির উপর ভিত্তি করে সংবিধান দাঁড়িয়ে থাকে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble)-র স্বরূপ বুঝতে হলে গণপরিষদে জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উত্থাপিত উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব (Objective Resolution)-এর দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। ১৯৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর গণপরিষদে নেহরু উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ১৯৪৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি সংশোধিত আকারে তা গৃহীত হয়। উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র (an Independent Sovereign Republic) বলে ঘোষণা করা হয়। প্রস্তাবে জনগণকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের (all power and authority) উৎস বলে বর্ণনা করা হয়। তাছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, মর্যাদা, সুযোগ সুবিধা ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইন ও জননৈতিকতার (Public Morality) অধীনে সব নাগরিককে চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম উপাসনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার প্রদানের কথাও প্রস্তাবে বলা হয়। সেই সঙ্গে অনুন্নত ও শোষিত সংখ্যালঘু শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা অবলম্বন, জাতীয় ভূখণ্ডের সংহতি (integrity of the territory of the Republic), বিশ্বশান্তি ও মানবজাতির কল্যাণ সাধন (promotion of world peace and welfare of mankind) ইত্যাদি বিষয়ের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নেহরুর উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাবের আদর্শকে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) বিশ্বস্তভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, ওই প্রস্তাবনার মধ্যেই ভারতীয় সংবিধানের প্রধান আদর্শ ও নীতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে।

০৩.৩ গণপরিষদে গণচরিত্রের অভাব

আমাদের দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন স্থানে সমালোচকরা ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদের গণচরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন এবং এর গণ চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্নও উত্থাপন করেছিলেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ভারতের গণপরিষদ প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়নি। গণপরিষদকে ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাদের মাত্র ১৩% ভোটদাতা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ওই আইনসভার প্রতিনিধিরাই ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে কংগ্রেস কর্তৃক তাদের বহুঘোষিত নীতির পরিপন্থী ছিল। ফলে গণপরিষদে সংবিধান রচনার কাজ স্থগিত রেখে নতুন করে প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আরেকটি নতুন গণপরিষদ গঠনের

দাবি গণপরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেই অনেকে উত্থাপন করেছিলেন। এই প্রস্তাবিত ও পুনর্গঠিত গণপরিষদই মুসাবিদা কমিটি (Drafting Committee) কর্তৃক রচিত খসড়া সংবিধানকে সংশোধন সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবে বলে আলোচ্য সদস্যরা দাবি করেছিলেন। কারণ তারা মনে করেছিলেন যে এই গণপরিষদ কখনই দেশের সমস্ত জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। কিন্তু উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে বাতিল হয়ে যায়। এই গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানের উপর জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য কোন গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়নি। তাই এই সংবিধানকে কোনমতেই জনগণের সংবিধান বলা যায় না বলে ভারতীয় সংবিধানের সমালোচকরা মনে করেন।

এই মতের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রস্তাবনার অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতে গণ-সার্বভৌমিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "আমরা ভারতের জনগণ... ১৯৪৯ সালের ছাব্বিশে নভেম্বর আমাদের গণপরিষদে এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।" এর অর্থ ভারতের জনগণই সংবিধানের রচয়িতা এবং চরম সার্বভৌম ক্ষমতার আধার যেহেতু ভারতের জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দ গণপরিষদে সমবেত হয়ে দেশের সর্বোচ্চ মৌলিক আইন হিসেবে সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করেছেন সেই অর্থে জনগণই দেশের সংবিধানের মূল রচয়িতা। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে গণপরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রী হরিবিষ্ণু কামাথ বলেছিলেন, গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ ব্যক্তি বিশেষ নন। তাঁরা হলেন ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি। গণপরিষদে তাঁরা সমস্ত ভারতবাসীর নামে এবং ভারতীয় জনগণের পক্ষে সংবিধান রচনার কাজ করেছেন। সুতরাং আইনগত দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে ভারতীয় জনগণকেই চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। গণপরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন যে ভারতীয় সংবিধানের উৎস জনগণ-এর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমিকতা জনগণেরই হস্তে ন্যস্ত রয়েছে। যেহেতু ভারতের সংবিধান জনগণ কর্তৃক রচিত ও গৃহীত হয়েছে সেই হেতু একে মান্য করা ভারতীয় মাত্রেরই নৈতিক কর্তব্য বলে অনেকে মনে করেন।

কিন্তু সমালোচকরা বলেছেন যে ভারতবর্ষের সংবিধানে জনগণকে সংবিধানের উৎস বলে বর্ণনা করা হলেও কার্যত ভারতবর্ষের সংবিধান রচনায় জনগণের তেমন কোন ভূমিকাই ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে সমগ্র ভারতীয় জনগণের শতকরা ১৩ ভাগ লোকের দ্বারা নির্বাচিত হওয়া ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত ভারতীয় গণপরিষদের কার্যত কোন গণভিত্তিই ছিল না। কাজেই বলা যায় যে গণপরিষদের সদস্যরা জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হননি এবং তাদের নির্বাচনে স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবান ভারতীয় পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কে. সি. হোয়ার (K. C. Wheare) বলেন, গণপরিষদে ভারতীয় জনগণ সংবিধান রচনা করেছিলেন বলা হয়, কিন্তু ভারতীয় জনগণের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিদের নিয়েই গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল।

০৩.৪ সংবিধানের উপর কোন গণভোট নেওয়া হয়নি

সংবিধানের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে কোন গণভোট না নেওয়ার জন্য ভারতীয় সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে সমালোচনার অবকাশ রয়ে গিয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের সংবিধান রচিত হবার পর সেই সংবিধানকে গণভোট দেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষে সেরকম কিছু করা হয়নি। ফলে রচিত সংবিধানের প্রতি জনগণের কতটা সমর্থন আছে তা যাচাই করবার সুযোগ হয়নি। সংবিধানকে গণভোটে পেশ না করেই 'ভারতীয় জনগণ সংবিধান রচনা করেছেন' এমন মত পোষণ করা অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এমনকি সংবিধান বিশেষজ্ঞ Dr. K. V. Rao তাঁর Parliamentary Democracy in India-তে মন্তব্য করেছেন যে এক অর্থে কংগ্রেসই ভারতীয় জনগণের উপর সংবিধানকে চাপিয়ে দিয়েছে।

১৯৪৯ সালে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের উৎস হল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাবিত ও গৃহীত ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ (India Independence Act 1947)। এই আইন বলেই গণপরিষদ ভারতীয় সংবিধান রচনা করার সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু ব্রিটিশ আইনের দ্বারা গঠিত গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানকে কোনক্রমেই ভারতীয় জনগণের সংবিধান বলে গণ্য করা যায় না। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'From Raj to Swaraj'-এ মন্তব্য করেছেন যে ব্রিটিশ আইনের দ্বারা যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছে তা কখনই ভারতীয় জনগণের সৃষ্ট বলে নিজেকে দাবি করতে পারে না।

তাছাড়া ভারতীয় গণপরিষদে কেবল প্রাদেশিক আইন সভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ছিলেন না, সেই সঙ্গে দেশীয় রাজবর্গের প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যরাও ছিলেন। সুতরাং গণপরিষদের সদস্যদের একটি অংশ রক্ষণশীল সামন্ততন্ত্রের এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র হিসেবে থাকায় গণপরিষদ গণচরিত্রলাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে সমালোচকরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেই জন্য সংবিধানের খসড়ার উপর প্রত্যক্ষভাবে জনমত যাচাই করার চিন্তা তাদের মনে আসেনি।

ভারতীয় সংবিধানের গণচরিত্র সম্বন্ধে এই সমালোচনার বিরুদ্ধে তিনটি যুক্তি দেখানো হয়।

প্রথমত, তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে গণপরিষদ গঠন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গণপরিষদ তৈরি করা খুব কঠিন কাজ ছিল।

দ্বিতীয়ত, গণপরিষদ সদস্যদের জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করার ব্যবস্থা করলেও গণপরিষদের গঠন প্রকৃতি অপরিবর্তিতই থাকত বলে মনে করা হয়। কারণ ওই সময় কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দলের ভাবমূর্তি জনমনে দৃঢ় ছিল না। জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত না হলেও গণপরিষদে পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারূপেই জনমনে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হবার পর ১৯৫২ সালে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে

নতুন কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হয় সেই আইনসভা গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানকেই অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করেছে।

ভারতের সংবিধানের সংশোধন ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল। ভারতের পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মতই সহজ পদ্ধতিতে সংবিধানের অধিকাংশ ধারাই প্রয়োজনে সংশোধন করতে পারা যায়। এতাবৎকাল প্রায় নব্বইটি সংশোধন ছাড়াও অন্তত দু'বার বিদ্যমান সংবিধানের আমূল পরিবর্তনের উপলক্ষ্য দেখা দিয়েছে। একবার ইন্দিরা গান্ধির আমলে ৪২তম সংশোধনকালে। দ্বিতীয়বার, বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকারের উদ্যোগে। ১৯৯৯ সাল থেকে একটি সংবিধান পর্যালোচনা কমিশন কাজ করে চলেছে। উভয়ক্ষেত্রেই সংসদের অনুমোদনকেই সংবিধান পরিবর্তনের বৈধতা জ্ঞাপক বলে ধরা হয়েছে। সুতরাং দীর্ঘ পাঁচ দশকের ওপর একটানা প্রয়োগ এবং নিয়মিত সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ভারতের সংবিধান নিশ্চিতভাবেই গণসমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছে বলা যায়। সর্বোপরি এই সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি (basic features) যাতে কোনো শাসকদল সাময়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিকৃত বা বিনষ্ট না করতে পারে, দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ও সেই মর্মে আদেশ জারি রেখেছেন।

০৩.৫ গণপরিষদের কাজে পদ্ধতিগত ত্রুটি

গণপরিষদে কংগ্রেস দলের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় প্রকৃতিগতভাবেও গণপরিষদ কংগ্রেস পরিষদে রূপান্তরিত হয়েছিল। পাকিস্তানে স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠিত হওয়ায় ভারতীয় গণপরিষদে কংগ্রেসের শক্তি ও প্রাধান্য আরও বেড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জন অস্টিন বলেছেন প্রধানত একদলীয় দেশে গণপরিষদ হল একটি একদলীয় সংস্থা (One Party Body)। গণপরিষদই ছিল কংগ্রেস আর কংগ্রেসেই ছিল ভারতবর্ষ (The Assembly was the Congress and the Congress was India)। বাহ্যত, গণপরিষদ, কংগ্রেস এবং সরকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সবাই ছিল এক। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে আবার নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আজাদের সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব গণপরিষদের গঠন ও সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর এই ভূমিকা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন অস্টিন (John Austin) কংগ্রেস গোষ্ঠী-প্রাধান্য (Congress Oligarchy) বলে অভিহিত করেছেন। এহেন গণপরিষদের কার্যপদ্ধতিতে ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। ভারতীয় গণপরিষদের কাজে এই কারণে নানা পদ্ধতিগত ত্রুটি ঘটেছিল।

০৩.৬ সামাজিক বিপ্লবের অঙ্গীকারের প্রকৃত স্বরূপ

মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষমতার হস্তান্তর (transfer of power) মাত্র। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে পরিত্যক্ত উপনিবেশে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করে। বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (M.N. Roy) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (Communist International)-এর সভায় তাঁর বিখ্যাত উপনিবেশ বিমোচনের যে তত্ত্ব (Theory

of Decolonisation) হাজির করেন তাতে তিনি স্পষ্টতই বলেন যে আগামী দিনে বিপন্ন সাম্রাজ্যবাদ স্বেচ্ছায় উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পরিত্যাগ করে চলে যাবে।

ভারতের গণপরিষদের গঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেসময় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। জওহরলালের মতো কিছু উদারপন্থী রাজনৈতিক নেতারা গণপরিষদে স্থান লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের রক্ষণশীল পুঁজিবাদের সঙ্গেই আপোস করতে হয়েছিল। তাছাড়া গণপরিষদে দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি থাকায় তাঁরা সব সময়েই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। এর ফলে কার্যত গণপরিষদ বুর্জোয়া জমিদার শাসিত শাসনব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিল তাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনের জন্য কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হয়নি। সংবিধানের মধ্যে যেমন কাজের অধিকার লিপিবদ্ধ হয়নি তেমনি সমাজের মধ্যেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন গণপরিষদ-সদস্য আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে ভারতের সংবিধান পুঁজিপতিদের কাছে মহাসনদ হলেও দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ওই সংবিধানে করা হয়নি।

মনে রাখা প্রয়োজন যে সংবিধান হল একটি লিখিত দলিল। রাজনীতি তাকে ব্যবহারিক রূপ দেয়। বলাবাহুল্য, শাসক আর শাসিতের মধ্যে সম্পর্কই হল রাজনীতির মূলকথা। সুতরাং ভারতের সংবিধান তার রাজনীতি। বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতরাষ্ট্র ও তার শাসকশ্রেণির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিতে সহায়তা করে। আবার উপরিকাঠামোর এই বিচার বিশ্লেষণ ভারতরাষ্ট্র ও তার সংবিধানের অর্থনৈতিক ভিত্তি (economic foundation) সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে আমাদের সাহায্য করে। কারণ প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে তার উপরিকাঠামো।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানে যেভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শ্রেণি চরিত্রের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে, ভারতের সংবিধানে সেরূপ কিছু বলা হয়নি। তবে সংবিধানের বিভিন্ন অংশ এবং ভারতীয় রাজনীতির কষ্টিপাথরে বিচার বিশ্লেষণের মারফত আমরা ভারতের সংবিধান তথা সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তির স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

ভারতীয় সংবিধানে কেবল রাজনৈতিক লোকতন্ত্র নয়, সমাজতান্ত্রিক লোকতন্ত্রেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ডঃ আম্বেদকর সংবিধান সভায় তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেছিলেন যে রাজনৈতিক লোকতন্ত্রের ভিত্তি মূলে যদি সামাজিক লোকতন্ত্র না থাকে তা হলে তা স্থায়ী হতে পারে না। সামাজিক লোকতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন যে এটা এমন এক জীবনধারা যা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সভ্য জীবন যাপনের পক্ষে অপরিহার্য কতগুলি ন্যূনতম অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারা যাবে ততদিন পর্যন্ত কোন অর্থেই লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা

যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে কতকগুলি অধিকার প্রত্যাভূত করা অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি না সামাজিক কাঠামো থেকে সমস্ত রকম অসামান্যতা দূর করা যায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরকার শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশে তাকে সমান প্রতিষ্ঠার ও সুযোগের নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। ভারতের সংবিধানে এই উদ্দেশ্য সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

এই সব উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে অবশ্যই রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সম্প্রসারণ দরকার। সেইজন্য সংবিধানের একটি বিশেষ অধ্যায়ে (Part IV) নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখকালে যে লক্ষ্য সামনে রাখা হয়েছে তা হল কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

০৩.৭ সারাংশ

প্রত্যেক দেশের সংবিধানের একটি নিজস্ব দর্শন আছে। একটি সংবিধানের দর্শন বা আদর্শ বলতে সেইসব আদর্শ (ideals) বা নীতি সমূহকে (policies) বোঝায় যেগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সংবিধান তৈরি হয়।

গণপরিষদে জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উত্থাপিত 'উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব' (Objective Resolution)-এর দিকে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। ১৯৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর গণপরিষদে নেহরু উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের ২৩ শে জানুয়ারি তা সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। 'উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব'-এ ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র (an Independent Sovereign Republic) বলে বর্ণনা করা হয়। প্রস্তাবে জনগণকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের (Source of all power and authority) উৎস বলে বর্ণনা করা হয়। নেহরু উত্থাপিত উদ্দেশ্য সমূহ প্রস্তাবের (Objective Resolution) আদর্শকে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Premble) বিশ্বস্তভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবনার মধ্যেই ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান আদর্শ ও নীতিগুলি বর্ণিত হয়েছে।

০৩.৮ অনুশীলনী

১। ভারতীয় গণপরিষদের কোন গণচরিত্র ছিল না বলে অভিযোগকারীদের যে অভিযোগ তা কতটা যুক্তিসংগত?

২। কী কারণে ভারতের সংবিধানের উপর গণভোট নেওয়া হয়নি সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। গণপরিষদের কাজের পদ্ধতিগত ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৪। ভারতীয় গণপরিষদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একক দলীয় প্রাধান্য ঘটার কারণ কী?

৫। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতে সামাজিক বিপ্লবের যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল সে অঙ্গীকার কতটা রক্ষিত হয়েছে?

০৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি — *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামানিক।*

(২) Recent Trends in Indian Nationalism — *A. R. Desai.*

(৩) Introduction to the Constitution of India — *Dr. Durgadas Basu.*

(৪) Parliamentary Democracy in India — *K. V. Rao.*

(৫) From Raj to Swaraj — *Dr. D. N. Sen*

(৬) The Indian Constitution : Corner stone of a Nation — *Granville Austin*

(৭) ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি — *অনাদিকুমার মহাপাত্র।*

একক ০৪ ❐ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

গঠন

০৪.১ উদ্দেশ্য

০৪.২ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার অর্থ ও গুরুত্ব

০৪.৩ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার বর্তমান রূপ

০৪.৪ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার উৎস

০৪.৫ ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতি

০৪.৬ প্রস্তাবনায় ঘোষিত মূল নীতিসমূহ

০৪.৭ মূল্যায়ন

০৪.৮ অনুশীলনী

০৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

০৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের মধ্যে আছে ভারতের সংবিধানেব প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনাটি পড়লে আমরা ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য ও আদর্শগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবো। প্রথমে সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার শেষে রয়েছে বিভিন্ন প্রশ্নাবলী।

০৪.২ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার অর্থ ও গুরুত্ব

কোনো দেশের শাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনের সমষ্টিকে সাধারণভাবে দেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলা হয়। প্রায় সকল দেশেই দেখা যায় যে লিখিত সংবিধানের মূল অংশের আগে একটি প্রস্তাবনা যোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পথিকৃৎ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৭৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানের আগে সর্বপ্রথম একটি প্রস্তাবনা যোগ করা হয়েছিল।

প্রস্তাবনা আসলে সংবিধানের মূল অংশকে উপলব্ধি করার চাবিকাঠি। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে কোনো লেখক তাঁর মূল বইটি শুরু করার আগে একটি ভূমিকা লেখেন। এই ভূমিকাটি পড়লে বইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি আভাস পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি প্রস্তাবনাও হল সংবিধানের ভূমিকা বা মুখবন্ধ। প্রস্তাবনা আমাদের সংবিধানের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সংবিধান কেবলমাত্র একটি নিছক আইনগত দলিল নয়। প্রত্যেক সংবিধানই কতকগুলি আদর্শ বা নীতির

ভিত্তিতে রচিত হয়। প্রখ্যাত সংবিধানবিদ ডাঃ দুর্গাদাস বসু বলেছেন যে প্রত্যেক সংবিধানেরই একটি নিজস্ব দর্শন আছে। প্রস্তাবনার মাধ্যমে সংবিধানের দর্শন প্রতিফলিত হয়। প্রস্তাবনার গুরুত্ব হলো এই যে সংবিধান রচয়িতারা যে সমস্ত আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে সংবিধানটি রচনা করেছেন প্রস্তাবনা সেগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে। তবে প্রস্তাবনার আইনগত মূল্য বিশেষ নেই। প্রস্তাবনা মূল সংবিধানের অংশ নয়। মূল সংবিধানের ভাষা ও বক্তব্য যদি স্পষ্ট হয় তবে প্রস্তাবনা তার অর্থের কোনো রকম পরিবর্তন করতে পারে না। প্রস্তাবনার সঙ্গে মূল সংবিধানের কার্যকরী অংশের কোনো বিরোধ দেখা দিলে আদালত সংবিধানের কার্যকরী অংশকেই প্রাধান্য দেয়। তবে মূল সংবিধানের ভাষা বা বক্তব্যগত অস্পষ্টতা থাকলে সেই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য প্রস্তাবনার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

০৪.৩ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার বর্তমান রূপ

এবার আমরা ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সংবিধান রচনার সময় মূল প্রস্তাবনাটি যেরকম ছিল, পরবর্তীকালে তার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে মূল প্রস্তাবনাটির সঙ্গে তিনটি নতুন শব্দ যোগ করা হয়েছে। এই শব্দগুলি হলো 'Socialist' বা 'সমাজতান্ত্রিক', 'Secular' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'Integrity' বা 'সংহতি'। ভারতের সংবিধানের বর্তমান প্রস্তাবনাটি হল এইরকম।

"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিকের জন্য

সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ন্যায়বিচার;

চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা;

মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

০৪.৪ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার উৎস

প্রস্তাবনার শুরুতে 'আমরা ভারতের জনগণ' শব্দগুলির মাধ্যমে সংবিধানের উৎসটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার এই শব্দগুলিকে প্রস্তাবনার সবচেয়ে বৈপ্লবিক শব্দগুচ্ছ বলে অভিহিত করেছেন। এস্.এল্. সিক্রি বলেন যে ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে 'আমরা ভারতের জনগণ' বক্তব্যটির অর্থ হল এই যে ভারতের বর্তমান সংবিধান ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই আইনগুলি সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা

রচিত হয়েছিল এবং ভারতবাসীর ওপর আরোপ করা হয়েছিল। ভারতের নতুন সংবিধান ভারতেই গৃহীত হয় এবং এই সংবিধান ভারতবাসীকেই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলে মনে করে। ডাঃ দুর্গাদাস বসুকে অনুসরণ করে বলা যায় যে 'জনগণ' শব্দটির দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে যে ভারতীয় সংবিধান কয়েকটি রাজ্যের অধিবাসীদের দ্বারা রচিত হয়নি। 'জনগণ' শব্দটির দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমস্ত ভারতবাসীকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কোনো একটি বা কয়েকটি রাজ্য এই সংবিধান ভঙ্গ করতে পারে না বা ভারত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এই সংবিধানকে মেনে চলার দায়িত্ব প্রত্যেক ভারতবাসীর আছে।

'আমরা ভারতের জনগণ' এই বক্তব্যের সমালোচনা করে অনেকে বলেছেন যে ভারতের সংবিধানের উৎস ভারতের জনগণ — এই ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ সংবিধান রচনা করেছে গণপরিষদ। এই গণপরিষদ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয়নি। আবার জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্যে সংবিধানকে গণভোটেও পেশ করা হয়নি। অনেকে মনে করেন যে তখনকার পরিস্থিতিতে গণপরিষদ গঠনের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না। সংবিধানকে গণভোটে পেশ করাও ছিল যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আরও বলা হয় যে সংবিধান প্রবর্তনের পর প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিতে সকল দল ও জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছে। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে জনসাধারণ এই সংবিধানকে গ্রহণ করেছে।

০৪.৫ ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতি

(ক) প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতা হল সেই ক্ষমতা যার জোরে রাষ্ট্র আইন তৈরি ও প্রয়োগ করতে পারে। এই ক্ষমতার জোরেই রাষ্ট্র আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দিতে পারে। সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক আছে — আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অর্থ হল এই যে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের আইন মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলতে বোঝায় যে রাষ্ট্রের ওপর কোন বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দুটি দিক থেকেই ভারত হল একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। কারণ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতের ওপর কোনো বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই।

ভারত কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্-এর সদস্য। কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্ হল বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। ব্রিটিশ রাজা বা রানি হলেন এই কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্-এর প্রতীকী প্রধান। ১৯৮৯ সালের ২৭ শে এপ্রিল লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীদের একটি সম্মেলনে জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে ভারত একটি সার্বভৌম, স্বাধীন, প্রজাতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্-এর পূর্ণ সদস্য থাকবে। অনেকে মনে করেন যে কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্-এর সদস্য হওয়ায় ভারতের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের সংবিধানে এই ঘোষণার কোন উল্লেখ নেই। এই ঘোষণার ফলে ভারতের নাগরিকরা ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে কোনো রকম আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য নয়। কমনওয়েলথ-

এর সম্মেলনগুলিতে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে নেবার বাধ্যবাধকতাও ভারতের নেই। ভারত স্বেচ্ছায় এই সংগঠনের সদস্য হয়েছে এবং স্বেচ্ছায় এই সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে। সুতরাং কমনওয়েলথ-এর সদস্য হওয়ার ফলে ভারতের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

(খ) ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংশোধনের দ্বারা প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। সমাজতন্ত্র হল ধনতন্ত্রের বিপরীত সমাজব্যবস্থা। এখানে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা মুষ্টিমেয় ধনীব্যক্তির হাতে থাকে না। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের ওপর সামাজিক মালিকানা বজায় থাকে। এখানে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টনব্যবস্থার ওপরেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। তবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী ভারতকে পরিপূর্ণ অর্থে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা সংবিধানের লক্ষ্য নয়। এখানে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণগুলির রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়নি। আবার বেসরকারি সম্পত্তিরও সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা হয়নি। ভারতে সকল সম্পত্তি ও শিল্পের পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণের পরিবর্তে 'মিশ্র অর্থনীতি' গৃহীত হয়েছে। এখানে অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে। ভারতে গৃহীত সমাজতন্ত্রের আদর্শ হল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ। জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করাই এর লক্ষ্য।

(গ) ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধন প্রস্তাবনায় 'Secular' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। ধর্মীয় সম্প্রীতি ভারতের জাতীয় জীবনের একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় যুক্ত হওয়ার ফলে এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের মূল কথা হল এই যে ভারত রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে স্বীকার করে না। রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা পোষণ করবে না। এখানে সকল মানুষ নিজের বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী যে কোনো ধর্ম অবলম্বন করতে পারবে। রাষ্ট্র সকল ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন আচরণ করবে এবং ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোনরকম বিভেদমূলক আচরণ করবে না। ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করেন। প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ঘোষণা করে এই বহু ধর্মের দেশের জনগণের মধ্যে একতাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

(ঘ) প্রস্তাবনায় ভারতকে 'গণতন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গণতন্ত্র বলতে জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। ভারতে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করে না। এখানে গণতন্ত্র হল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র। এখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করেন। ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। জনগণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। ভারতে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যে রাজ্যপাল হলেন শাসকপ্রধান। তাঁদের নামে শাসন পরিচালিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শাসনপরিচালনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ। এই মন্ত্রীপরিষদ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে দায়ী থাকে।

(৬) প্রস্তাবনায় ভারতকে 'সাধারণতন্ত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সাধারণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য কোনো ভাবে রাজপদের অস্তিত্ব থাকে না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠিত হয়। ভারতের শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানির কোনো স্থান নেই। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখানে স্ত্রী-পুরুষ, বংশ, ধর্ম ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকই প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন। উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার সকলেরই আছে।

০৪.৬ প্রস্তাবনায় ঘোষিত মূলনীতিসমূহ

প্রস্তাবনায় সংবিধানের চারটি মূল নীতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই নীতিগুলি হল ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে আমরা সকলেই সমাজে বাস করি। একজন ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে আমাদের ব্যক্তি-স্বার্থ অবশ্যই থাকবে। তবে ব্যক্তি-স্বার্থের পাশাপাশি সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। ন্যায় হল সেই নীতি যা ব্যক্তি-স্বার্থ ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। প্রস্তাবনায় ব্যাপক অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি সার্বিক প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে। প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের প্রতি সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদাহরণ হিসাবে অস্পৃশ্যতার বিলোপ, অনুন্নত শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা প্রভৃতির কথা বলা যায়। প্রস্তাবনায় ভারতকে 'সমাজতন্ত্র' বলে ঘোষণা করার মধ্যে আর্থিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম দৃষ্টান্ত হল সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি।

প্রস্তাবনায় সকল নাগরিককে চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা দেবার কথা বলা হয়েছে। এগুলির মাধ্যমে যাতে নাগরিকের ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। স্পষ্টতই স্বাধীনতার অর্থ এখানে নিয়ন্ত্রণবিহীনতা নয়। ব্যক্তির আচরণের ওপর কোনো বাধানিষেধ থাকবে না এই নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়নি। স্বাধীনতা শব্দটিকে এখানে সদর্থক বা ইতিবাচক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশকে বোঝানো হয়েছে।

প্রস্তাবনায় সাম্যের নীতির মাধ্যমে সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমান ব্যক্তি-মর্যাদা ও সুযোগের সমতার কথা বলা হয়েছে। সাম্যের নীতিকে রূপায়িত করার জন্য সংবিধানের ১৪-১৮ ধারায় সাম্যের অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধিকারের মধ্যে আইনের সমতা, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। আবার বংশ, বর্ণ, জন্মস্থান, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভেদকরণ নিষিদ্ধ হয়েছে।

প্রস্তাবনায় ঘোষিত অন্যতম একটি নীতি হলো ভ্রাতৃত্ব। সংবিধান প্রণেতারা একথা যথার্থই উপলব্ধি

করেছিলেন যে ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা দরকার। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের ফলে প্রস্তাবনায় জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে 'সংহতি' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। ভারত বহু ভাষাভাষী এবং বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ। এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রস্তাবনা এক শক্তিশালী জাতিগঠনের আদর্শ গ্রহণ করেছে।

০৪.৭ মূল্যায়ন

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার মূল্যায়নে বলা যায় যে প্রথমত, প্রস্তাবনায় সংবিধানের উৎস সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়ত, সংবিধান প্রণেতারা কী ধরনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন প্রস্তাবনায় সেটি ব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রস্তাবনায় সংবিধানের আদর্শ ও মূলনীতিগুলি ঘোষিত হয়েছে। এই আদর্শ ও নীতিগুলি যে আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য, প্রস্তাবনা আমাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দিক থেকে প্রস্তাবনার নৈতিক মূল্য আছে। প্রস্তাবনা সমগ্র জাতি ও জাতির প্রতিনিধিদের কাছে একটি পথনির্দেশক। তবে প্রস্তাবনায় আদর্শ ও নীতিগুলির ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। এই আদর্শ ও নীতিগুলিকে বাস্তবে কতটা রূপায়িত করা হয়েছে সেটি হলো মূল বিচার্য বিষয়। প্রস্তাবনায় ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি নীতিগুলির ঘোষণা সত্ত্বেও বাস্তবে এই নীতিগুলির সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রস্তাবনায় ঘোষিত আদর্শগুলিকে সার্থক করে তোলার জন্য উপযুক্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা দরকার।

০৪.৮ অনুশীলনী

রচনাত্মক উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :-

(১) প্রস্তাবনা কাকে বলে? প্রস্তাবনার গুরুত্ব কী? ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে কী ধরনের রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে?

(২) প্রস্তাবনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। প্রস্তাবনায় বর্ণিত ভারতরাষ্ট্রের মূলনীতিগুলি বর্ণনা কর।

(৩) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

(৪) (ক) ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় কী পরিবর্তন করা হয়েছে?

(খ) প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের উৎস কী?

(গ) প্রস্তাবনা অনুসারে ভারত কী ধরনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র?

(ঘ) ভারতকে কি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা যায়?

(ঙ) ভারতকে কি সাধারণতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়?

(চ) কোন্ সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা এবং কবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় সংযোজিত হয়েছে?

০৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) দুর্গাদাস বসু—ভারতের সংবিধান পরিচয়, প্রেন্টিস হল অব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী।

(২) অনাদি কুমার মহাপাত্র—ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।

(৩) অপূর্ব মোহন মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস নন্দী (সম্পাদিত)—ভারতীয় রাজনীতি, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।

একক ০৫ ☐ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ

গঠন

০৫.১ উদ্দেশ্য

০৫.২ ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার— সাম্যের অধিকার

০৫.৩ স্বাধীনতার অধিকার

০৫.৪ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

০৫.৫ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

০৫.৬ সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার

০৫.৭ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

০৫.৮ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ

০৫.৯ রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ

০৫.১০ সারাংশ

০৫.১১ অনুশীলনী

০৫.১২ গ্রন্থপঞ্জী

০৫.১ উদ্দেশ্য

সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্য কতকগুলি সুযোগ সুবিধার দরকার হয়। সাধারণভাবে এই সুযোগ সুবিধাগুলিকেই আমরা অধিকার বলে থাকি। এই অধিকারগুলির মধ্যে কতকগুলি অধিকার আবার মানুষের সুস্থ জীবন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য। মানুষের জীবনের পক্ষে এই একান্ত অপরিহার্য অধিকারগুলি মৌলিক অধিকার হিসাবে পরিগণিত হয়। যে সমস্ত দেশে লিখিত সংবিধান থাকে সেই সমস্ত দেশে এই লিখিত সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ থাকে। এই মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।

০৫.২ ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার - সাম্যের অধিকার

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের জন্য কতকগুলি অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই

অধিকারগুলির মধ্যে প্রথম অধিকারটি হলো সাম্যের অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ১৪-১৮ ধারায় এই অধিকারটির উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার সাম্যের ধারণা একটি ব্যাপক ধারণা। মানুষের জীবনের সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এই ধারণা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আমাদের সংবিধান রচয়িতারা একথা বুঝেছিলেন যে সদ্যস্বাধীন ভারতের নাগরিকদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল একটি সুদূর পরিকল্পনা যেটির তাৎক্ষণিক রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। সেই কারণে তাঁরা সাম্যের অধিকারের ক্ষেত্রে রাজনীতিক ও আইনানুগ সমতার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

১৪ নম্বর ধারা - সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের ভূখণ্ডের ভেতরে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে সমতা বা আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকারকে অস্বীকার করবে না। ধারাটিতে দুটি নীতির উল্লেখ রয়েছে, যথা (১) আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং (২) আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষণ। বিচারপতি কে. সুব্বারাও এই দুটি নীতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ১৯৬০ সালে উত্তর প্রদেশ বনাম দেওমন মামলায় রায় দেবার সময় তিনি বলেন যে এই নীতি দুটির মধ্যে প্রথম নীতিটি হল নেতিবাচক এবং দ্বিতীয় নীতিটি হল ইতিবাচক। প্রথম নীতিটি এই অর্থে নেতিবাচক যে এর দ্বারা বিশেষ সুযোগ সুবিধার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় নীতিটি এই অর্থে ইতিবাচক যে এটি আইনের সমান আচরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' ধারণাটির ক্ষেত্রে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা গ্রেট-ব্রিটেনের প্রথাগত আইন এবং ডাইসির আইনের অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত হন। ডাইসির ধারণা অনুসারে আইনের দৃষ্টিতে সমতার অর্থ হল এই যে কোনো ব্যক্তিই দেশের আইনের ঊর্ধ্বে নন। দেশের সাধারণ আইন সকল ব্যক্তিকে সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সকল ব্যক্তিই সমানভাবে সাধারণ আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত হবেন। রাষ্ট্রের কাছে কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

ভারতে আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতির কিছু ব্যতিক্রম আছে। প্রথম ব্যতিক্রমটি হলো রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের ক্ষেত্রে। তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আদালতের কাছে দায়িত্বশীল হবেন না। তাঁরা যতদিন তাঁদের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারী মামলা আনা যাবে না। তাঁদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা আনতে হলে লিখিতভাবে দু'মাসের নোটিশ দিতে হবে।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রমটি হলো সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। তাঁরা পদাধিকারবলে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, সাধারণ নাগরিকরা সেই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম অনুসারে বিদেশি শাসক ও রাষ্ট্রদূত এই নিয়মের প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি পান।

চতুর্থত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে সাধারণ আদালতের পরিবর্তে শাসন বিভাগীয় বিশেষ আদালতের অস্তিত্ব দেখা যায়।

'আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত' হবার নীতিটি মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন থেকে গৃহীত হয়েছে। আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষণের অধিকার বলতে বোঝায় যে, যে সমস্ত ব্যক্তি একই অবস্থা বা একই পরিস্থিতিতে অবস্থিত তাদের সকলের প্রতি আইন একই রকম আচরণ করবে। তবে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন করা যায়। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন আয়ের তারতম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত করতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে আয়কর আদায় করতে পারে। শ্রেণি বিভাজনের দুটি শর্ত আছে। প্রথমত, শ্রেণিবিভাজনের ভিত্তি সুস্পষ্ট ও সমাজবোধ্য হবে। দ্বিতীয়ত, আইনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সেটির যথোপযুক্ত সম্পর্ক থাকা চাই।

১৫ নম্বর ধারা - সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারায় কয়েকটি বিশেষ কারণের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, জন্মস্থান, নারী-পুরুষ ইত্যাদির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এ ছাড়া সংবিধানের ১৫ (২) ধারা বলেছে যে এই কারণগুলির ভিত্তিতে দোকান, রেস্তোরাঁ, হোটেল বা জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত কোনো আমোদপ্রমোদের স্থানে কোনো নাগরিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা যাবে না। আবার যে সমস্ত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, পথ বা জনসমাগমের স্থান আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত বা জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সেগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

তবে ১৫ (৩) এবং ১৫ (৪) ধারায় কিছু ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাদের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম হতে পারে সে কথা সংবিধানে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১৫ (৩) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। ১৫ (৪) ধারায় উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলি হলো সামাজিক ও আর্থনীতিক দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণি এবং তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিসমূহের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

১৬ নম্বর ধারায় - সরকারি চাকরির অধীনে নাগরিকদের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৬ (১) ধারায় রাষ্ট্রের অধীনে নিয়োগ এবং চাকরিতে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে। ১৬ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে ধর্ম, বর্ণ, বংশ, জাতি, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা বাসস্থানের ভিত্তিতে কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের কোনো নিয়োগ বা চাকরির ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কেবলমাত্র এই কারণগুলির জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমতার অধিকারেরও কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে। প্রথমত, কোনো অঙ্গরাজ্য বা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের অধীনে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট আইন করে ওই রাজ্যে বসবাসের শর্ত আরোপ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকদের ক্ষেত্রে সরকারি চাকরি বা পদ সংরক্ষিত রাখা যায়। তবে এক্ষেত্রে সরকারকে প্রশাসনিক নৈপুণ্যের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। তৃতীয়ত, যে সমস্ত

চাকরি বা পদ কোনো বিশেষ ধর্মের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সেই সমস্ত চাকরি বা পদ সেই বিশেষ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

১৭ নম্বর ধারায় - সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতা আচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। বহু দিন থেকেই ভারতীয় সমাজে নিম্নবর্গের মানুষেরা অস্পৃশ্যতার অভিশাপের শিকার হয়ে ছিল। এই অবমাননাকর প্রথাটির বিলোপ সাধন করে সংবিধান সমাজের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে অস্পৃশ্যতার ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের ওপর কোনোরকম অযোগ্যতা বা অক্ষমতা সংক্রান্ত অপরাধ আরোপ করা যাবে না। ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধনের পর এ বিষয়ে প্রণীত আইনটি বর্তমানে Protection of Civil Rights Act নামে পরিচিত।

১৮ নম্বর ধারায় - ভারতের নাগরিকদের মধ্যে সমান সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১৮ নম্বর ধারাটির কথা উল্লেখযোগ্য। ১৮ নম্বর ধারায় কৃত্রিম বিভেদমূলক উপাধি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৮ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক গুণের পরিচায়ক নয় এমন কোনো খেতাব বা উপাধি কোনো নাগরিককে দিতে পারবে না। ১৮ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো খেতাব গ্রহণ করতে পারবে না। সংবিধানের ১৮ (৪) ধারা অনুযায়ী ভারত সরকারের অধীনে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন এমন কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো উপঢৌকন বা বেতন বা কোন পদ গ্রহণ করবে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ গুণের স্বীকৃতি হিসাবে ভারতে নাগরিকদের 'ভারতরত্ন', 'পদ্মভূষণ', 'পদ্মশ্রী' প্রভৃতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ১৯৫৪ সাল থেকেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ব্যবস্থা বাতিল হয়। কিন্তু ১৯৮০ সালে কংগ্রেস (ই) সরকার ক্ষমতায় ফিরে এলে এই ব্যবস্থাটি পুনরায় প্রবর্তিত হয়।

সংবিধানে খেতাব প্রদানের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনায় বলা হয় যে এই ব্যবস্থা সাম্যের নীতি বিরোধী। এর ফলে এক বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত কিছু নাগরিকের সৃষ্টি হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে এই সম্মানজনক উপাধি প্রদান করে বিশিষ্ট নাগরিকদের বিশেষ গুণাবলীকেই স্বীকৃতি জানানো হয়। তাছাড়া এই খেতাব নামের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় না। এর ফলে নাগরিক কোনো বিশেষ সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন না। সুতরাং খেতাব বা উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা সাম্যের নীতির পরিপন্থী নয় বলেই অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সাম্যের অধিকারের মূল্যায়ন ঃ

ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত সাম্যের অধিকারটি বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথমত, এই অধিকারটি হল মূলত আইনগত এবং রাজনীতিক অধিকার। আর্থনীতিক সাম্যের কথা এই অধিকারটির মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু আর্থনীতিক সাম্য ছাড়া সাম্যের অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করেন যে অঙ্গরাজ্যের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে বসবাসগত যোগ্যতার শর্ত সাম্যের নীতির বিরোধী।

তৃতীয়ত, সংবিধানে বলা হয়েছে যে যুক্তিসঙ্গত কারণে রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন করতে পারে। কিন্তু সমালোচকদের মতে, এই শ্রেণিবিভাজনের যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

চতুর্থত, অগ্রসর শ্রেণি এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে যে বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেটি কোনো সরকার রাজনীতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে কেবল মাত্র সাংবিধানিক ঘোষণার মাধ্যমে সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এর জন্য আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনও দরকার।

০৫.৩ স্বাধীনতার অধিকার

ভারতীয় সংবিধান যে সমস্ত আদর্শ রূপায়ণের সংকল্প গ্রহণ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল স্বাধীনতার আদর্শ। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভারত হল গণতান্ত্রিক দেশ। স্বাধীনতা ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। স্বাধীনতা কাকে বলে সেটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক ল্যাস্কি। তাঁকে অনুসরণ করে বলা যায় যে স্বাধীনতা বলতে সেই পরিবেশকে রক্ষা কবা বোঝায় যেখানে মানুষের ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকে।

১৯ নং ধারাভুক্ত ছয়টি অধিকার ঃ

ভারতীয় সংবিধানের ১৯-২২ নম্বর ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ আছে। এই ধারাগুলির মধ্যে ১৯ নম্বর ধারাটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মূল সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় সাতটি অধিকারের উল্লেখ ছিল। এই অধিকার হল, (১) ভারতের নাগরিকদের বাক্য ও মতপ্রকাশের অধিকার থাকবে। (২) তারা শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হতে পারবে। (৩) ভারতের নাগরিকরা সমিতি বা সংঘ গঠন করতে পারবে। (৪) তারা ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে। (৫) ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনো অংশে তারা বসবাস করতে পারবে। (৬) তাদের সম্পত্তি অর্জন, দখল ও হস্তান্তর করার অধিকার থাকবে। (৭) ভারতের নাগরিকরা যে কোনো বৃত্তি অবলম্বন করতে পারবে অথবা তারা যে কোনো উপজীবিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারবে। ১৯৭৮ সালে ভারতের সংবিধানের ৪৪তম সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনের পরে সম্পত্তি অর্জন, দখল ও হস্তান্তর করার অধিকারটিকে আর মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করা হয় না। সুতরাং এখন ১৯ নম্বর ধারায় সাতটির জায়গায় ছটি অধিকার আছে।

অধিকারগুলির গুরুত্ব

১৯ নম্বর ধারায় যে অধিকারগুলির কথা বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সেগুলির বিশেষ মূল্য

আছে। গণতন্ত্রের ভিত্তি হল স্বাধীন জনমত। চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার না থাকলে সমাজে সুস্থ ও সবল জনমত গড়ে উঠতে পারে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের সংবিধানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি। গণপরিষদে ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রয়েছে। ১৯ নম্বর ধারায় নাগরিকদের সমবেত হওয়ার অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। সমবেত হওয়ার অধিকার থাকলেই মানুষের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান সহজ হয়। এই ভাব-বিনিময়ই জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সংঘ ও ইউনিয়ন গঠনের অধিকারটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের পক্ষে একক ও বিচ্ছিন্নভাবে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। সমিতি বা ইউনিয়নের মাধ্যমে দলবদ্ধভাবে মতামত জ্ঞাপন করা ও অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভব হয়। ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের নাগরিকরা ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাস করতে পারবে। ১৯৫০ সালে গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় বিচারপতি বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে এই অধিকারটির মাধ্যমে সারা ভারতের একতা ও অভিন্নতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯ নম্বর ধারায় ভারতের নাগরিকদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তারা যে-কোনো উপজীবিকা বা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারে। ভারতীয় সমাজে বহু প্রাচীন কাল থেকেই বর্ণ বা জাত ব্যবস্থার প্রভাব দেখা যায়। বর্ণ বা জাতের ভিত্তিতে পেশাগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে নির্ধারিত হত। এইভাবে নির্ধারিত পেশাকেই মেনে নিতে ব্যক্তি বাধ্য থাকত। স্বাধীন ভারতের সংবিধান বৃত্তি, উপজীবিকা বা বাণিজ্যের অধিকার স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের সুযোগ করে দিয়েছে। অধ্যাপক পাইলি বলেছেন যে ভারতে একটি গতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে এটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

অধিকারগুলির সীমাবদ্ধতা ঃ

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১৯ নম্বর ধারায় যে অধিকারগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি অবাধ নয়। অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের সংবিধান রচয়িতারা ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। সেই কারণে সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারার ২-৬ উপধারায় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্র নাগরিকের স্বাধীনতার ওপর যে সমস্ত বাধানিষেধ আরোপ করেছে সেগুলি যুক্তিসঙ্গত কিনা সেটি দেখার দায়িত্ব আদালতকে দেওয়া হয়েছে।

বাক্য ও মতপ্রকাশের অধিকারের ওপর কতকগুলি কারণে বাধানিষেধ আরোধ করা হয়েছে। প্রথমত, এই অধিকারটিকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ না হয়। দ্বিতীয়ত, এই অধিকার প্রয়োগের ফলে ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তৃতীয়ত, এই অধিকার প্রয়োগ করে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের কোনোরকম অমর্যাদা করা যাবে না। চতুর্থত, জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হয় এমনভাবে অধিকারটি প্রয়োগ করা যাবে না। পঞ্চমত, শ্লীলতা ও সদাচার

অক্ষুণ্ণ রেখে অধিকারটি প্রয়োগ করতে হবে। ষষ্ঠত, বাক্য ও মতপ্রকাশের অধিকারের দ্বারা বিচারালয়ের অবমাননা করা যাবে না। সপ্তমত, এই অধিকার প্রয়োগের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপরাধমূলক কাজ করতে প্ররোচিত করা যাবে না।

সমবেত হওয়ার অধিকারের ওপর বাধানিষেধগুলি হল এই যে সমাবেশ শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হবে। আবার ভারতের সার্বভৌমিকতা, সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যেও সমবেত হওয়ার অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করা যায়। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনের ফলে এই শেষোক্ত বাধানিষেধগুলি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা ও সদাচার এবং ভারতের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতার স্বার্থে সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। ভারতের সর্বত্র চলাফেরা ও বসবাসের অধিকারকে জনস্বার্থ, তপশিলি উপজাতিদের স্বার্থ এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বৃত্তি বা উপজীবিকা গ্রহণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর অধিকারের ওপর জনস্বার্থে বাধানিষেধ আরোপ করা যায়। যেমন, কোনো বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনের জন্য কী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা দরকার সেটি রাষ্ট্র স্থির করে দিতে পারে। জনস্বার্থে সেটি করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। আবার জনস্বার্থে কোনো বিশেষ শিল্প বা বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার নাগরিককে না দিয়ে রাষ্ট্র সোজাসুজিভাবে নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। আবার এই ধরনের কোনো শিল্প বা বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো সংস্থার হাতেও অর্পণ করা যায়।

২০, ২১ এবং ২২ নং ধারার বিশ্লেষণ ঃ

সংবিধানের ২০ নম্বর ধারায় অপরাধীর দণ্ডবিধানের ব্যাপারে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ২০(১) ধারা অনুযায়ী কোনো কাজ প্রচলিত আইনভঙ্গের জন্য অপরাধজনক বলে বিবেচিত না হলে সেই কাজের জন্য কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা যাবে না আবার যে সময়কার অপরাধ সেই সময়ের প্রচলিত আইনে যে শাস্তি দেওয়া যেত তার থেকে বেশি শাস্তি অপরাধীকে দেওয়া যাবে না। ২০(২) ধারা অনুযায়ী একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না। ২০(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধানের ২১ নম্বর ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারাটিতে বলা হয়েছে যে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি (Procedure established by law) বলতে সেই পদ্ধতিকে বোঝায় যেটি আইনসভা বিধিসম্মতভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছে। যে আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে সেই আইনটি বৈধ আইনসভার দ্বারা সংবিধান-সম্মতভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা সেটি বিচার করার অধিকার আদালতকে দেওয়া হয়েছে। তবে ভারতের আদালত কেবল এইটুকুই বিচার করতে পারে যে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে কিনা। ন্যায়নীতির দিক থেকে আইনটি ভালো কী মন্দ আদালত সেটি বিচার করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের ক্ষমতা অনেক বেশি। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী আইনটি

বিধিসম্মতভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা কেবলমাত্র সেইটি বিচার করে না। আইনটির ন্যায্যতাও (due process of law) আদালত বিচার করে।

২২ নম্বর ধারায় কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২২(১) ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পর অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। আরও বলা হয়েছে আটক ব্যক্তি তাঁর পছন্দমত আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবেন। নিজের পছন্দ অনুযায়ী আইন ব্যবসায়ীর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আটক ব্যক্তিকে দিতে হবে। ২২(২) ধারায় বলা হয়েছে যে আটক ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া তাকে এই সময়ের বেশি আটক রাখা যাবে না। ২২(৩) ধারায় এই অধিকারের ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে কোনো শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি বা নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণমূলক অধিকারের ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।

কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোনো অপরাধ করতে পারে এই আশঙ্কার ভিত্তিতে যখন তাকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয় তখন সেই আটককে নিবর্তনমূলক আটক বলে। নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রথম প্রণীত হয় ১৯৫০ সালে। প্রথমে এক বছরের জন্য আইনটিকে গ্রহণ করা হলেও ক্রমশ এর মেয়াদ বাড়িয়ে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আইনটিকে বজায় রাখা হয়। এর পর ১৯৭১ সালে প্রণীত হয় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন বা 'মিসা'। ১৯৭৪ সালে পাশ হয় বিদেশি মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাই চালান নিবারণ আইন। এই আইনটি 'কোফেপোসা' নামে পরিচিত। ১৯৭৮ সালে জনতা ক্ষমতায় আসার পর 'মিসা' প্রত্যাহার করা হলেও 'কোফেপোসা' এখনও বজায় আছে। ১৯৮০ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ক্ষমতায় ফিরে আসার পর 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' বা 'NSA' পাশ করা হয়। ১৯৮১ সালে প্রণীত হয় 'ESMA' বা 'অত্যাবশ্যক সংস্থাসমূহে কাজকর্ম চালু রাখা আইন'। এই আইন অনুযায়ী অত্যাবশ্যক সংস্থাগুলিকে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার অধিকারের মূল্যায়ন :

ভারতীয় সংবিধানের স্বাধীনতার অধিকারের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই অধিকারটি অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ। ১৯ নম্বর ধারায় যে স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বহু রকমের বাধানিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাধানিষেধগুলির যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষেত্রে আদালত কেবলমাত্র বাধানিষেধের পদ্ধতিগত দিকটিই বিচার করতে পারে। ন্যায়নীতির দিক থেকে বিধিনিষেধগুলি কতদূর বৈধ আদালত সেটি বিচার করতে পারে না। রাজনীতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যেও কোনো দলীয় সরকার এই সাংবিধানিক বিধিনিষেধমূলক ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটকের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য হলেও স্বাভাবিক অবস্থায় এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করা যায় না।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতার অধিকারকে সার্থক করে তোলার জন্য নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই অধিকার থাকা দরকার। ভারতের ধনবৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অধিকারের সার্থক প্রয়োগ আশা করা যায় না।

০৫.৪ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রস্তাবনায় নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এইরকম সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্র এবং ন্যায়ের আদর্শকে রূপায়ণের সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে।

সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নং ধারা ঃ

সংবিধানের ২৩ ধারায় মানুষ বেচাকেনা, বেগার খাটানো এবং বলপূর্বক পরিশ্রম করানো নিষিদ্ধ হয়েছে। বলা হয়েছে যে এই নির্দেশ লঙ্ঘন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। ২৩(২) ধারায় বলা হয়েছে যে সার্বজনীন স্বার্থে রাষ্ট্র নাগরিকদের দিয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা শ্রেণির ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

২৩ নম্বর ধারায় বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডঃ দুর্গাদাস বসু বলেছেন যে আমাদের সংবিধানে 'মানুষ বেচাকেনা' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা যে কেবলমাত্র ক্রীতদাসত্ব নিষিদ্ধ হয়েছে তা নয়। নীতিবিরুদ্ধ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নারী, শিশু বা পশু লোকদের কাজে লাগানোও নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পার্লামেন্ট Suppression of Traffic in Women and Girls Act পাস করেছে।

সংবিধানের ২৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে চোদ্দ বছরের কম বয়সি শিশুদের কারখানা, খনিজ বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না, এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট কতকগুলি আইন পাস করেছে।

মূল্যায়ন ঃ

এই অধিকারটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে সমাজের বুক থেকে শোষণ দূর করতে হলে সমাজে আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। ধনবৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ণ আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে শোষণের অবসান ঘটানোর পরিকল্পনাকে বাস্তবে সার্থকভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়।

০৫.৫ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

ভারতে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে। এই বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধের সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। এটি আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যে স্বাধীনতার প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করেই ভারত বিভক্ত হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংবিধানপ্রণেতারা সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা সংবিধানে এমন কোনো ব্যবস্থা সংযোজন করেননি যার দরুন ভারতকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া যায়। ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাকে বলে? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে এমন একটি রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে ধর্মীয় বিবেচনা জড়িত থাকে না। কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়ে রাষ্ট্র কোনো প্রশাসনিক বা আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে না। রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদমূলক আচরণ করে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রেখে চলে। ডঃ আম্বেদকর মন্তব্য করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে একথা বোঝায় না যে আমরা জনগণের অনুভূতির কথা বিবেচনা করি না। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় যে পার্লামেন্ট বা সংসদ কোনো একটি বিশেষ ধর্মকে অপর সকল সম্প্রদায়ের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না।

ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের মূল কথা এই যে ধর্ম হল মানুষের ব্যক্তিগত বিবেক এবং বিশ্বাসের ব্যাপার। ব্যক্তির নিজস্ব বিবেক এবং বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মমত গ্রহণ ও পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির সংযোজন ঃ

গণপরিষদে সংবিধান প্রণেতাদের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু মূল সংবিধানের কোনো অংশে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির উল্লেখ করা হয়নি। মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের ফলে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় স্থান পেয়েছে।

সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ঃ

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম একটি অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ২৫-২৮ নম্বর ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা আছে।

২৫ নম্বর ধারায় ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা আছে। এই ধারায় ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে আদালতকে একটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোনো আচার-অনুষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পালনীয়

নীতির অঙ্গ কিনা আদালত সেটি বিচার করতে পারবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ২৫ নম্বর ধারা নাগরিককে ধর্ম প্রচারের অধিকার দিলেও বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করার অধিকারকে স্বীকার করা হয়নি।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর সংবিধানে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বাধানিষেধের কারণগুলি হল জনশৃঙ্খলা, সদাচার ও জনস্বাস্থ্য। আবার অন্যান্য মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যেও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা যায়। রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত কোনো অর্থনৈতিক, বৈত্তিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা লোকায়ত কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাছাড়া সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে অথবা হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সকল শ্রেণির হিন্দুদের কাছে উন্মুক্ত রাখার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে।

ভারতীয় সংবিধান কেবল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করেনি। সংবিধানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও কতকগুলি অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ২৬ নম্বর ধারায় এই অধিকারগুলির উল্লেখ আছে। এই ধারা অনুসারে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও পোষণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির ধর্মীয় বিষয়ে নিজ কার্যাদি পরিচালনার অধিকার থাকবে। এই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির ক্ষেত্রে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করার ও তার মালিক হবার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে তারা আইন অনুযায়ী এই সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। তবে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির এই অধিকারের ওপর রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, সদাচার ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

• সংবিধানের ২৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না।

সংবিধানের ২৮ নম্বর ধারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে কিছু বাধানিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত সেখানে কোনোরকম ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। এই ধারাটিতে আরও বলা হয়েছে যে সরকারের দ্বারা স্বীকৃত বা আংশিকভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মশিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষার্থীদের সম্মতি নিতে হবে। শিক্ষার্থী যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তবে তার অভিভাবকের সম্মতি নিতে হবে।

মূল্যায়ন ঃ

সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের আলোচনা প্রসঙ্গে সংবিধানবিদ ডঃ দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন যে ভারতের সাধারণ মানুষের গোটা জীবনে ধর্মের কী ভূমিকা সে সম্বন্ধে যাদের কোনোরকম ধারণা আছে তাদের কাছে এই অধিকারের ঘোষণা বিস্ময়কর ও প্রগতিশীল বলে মনে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের জন্যই ঘোষিত হয়নি। বিদেশিসহ সকল মানুষের ক্ষেত্রেই এই অধিকারটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র যাতে কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সংবিধানে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত, সংবিধানের ১৫(১) ধারায় কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কর্তৃক বিভেদমূলক আচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৫(২) ধারা অনুযায়ী সর্বসাধারণের ব্যবহার্য এবং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত স্থানগুলিতে প্রবেশের ব্যাপারে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। ১৬(২) ধারা অনুযায়ী ধর্মের ভিত্তিতে কোনো নাগরিক সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হয়েছে। ২৯(২) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদকরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। ৩২৫ ধারা অনুযায়ী ভোটাধিকারের ক্ষেত্রেও ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য সংবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২৯(১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র এই সম্প্রদায়ের ওপর তার নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কোনো সংস্কৃতি আরোপ করবে না। সংবিধানের ৩০ ধারা অনুসারে এই ধর্ম সম্প্রদায়গুলির নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকার থাকবে। আর্থিক সাহায্য দানের ব্যাপারে রাষ্ট্র এদের প্রতি কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি যে সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

অধ্যাপক জোহারি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, এই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ উদারনীতিক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু সংবিধান সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি সমানভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি একটি নিয়ন্ত্রিত ধারণা। জনশৃঙ্খলা, সদাচার এবং জনস্বাস্থ্যের কারণে রাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। তৃতীয়ত, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা হলো একটি গতিশীল ধারণা। বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্র প্রচলিত ধর্মীয় রীতি লঙ্ঘন করেও আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের বাস্তবায়ন কেবলমাত্র আইনগত এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে না। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও দেখা যায় যে সাম্প্রতিককালে সাম্প্রদায়িক বিরোধকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতিতে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং সমন্বয়ের আদর্শই হলো ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা। এর ওপরেই সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারভোগ নির্ভর করে। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে।

০৫.৬ সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার

ভারতবর্ষ এক বৈচিত্রপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং নাগরিকের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের জন্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ ধারায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯ ও ৩০ নং ধারার বিশ্লেষণ ঃ

সংবিধানের ২৯(১) ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাগরিকদের যে কোনো অংশ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও লিপি ব্যবহারের অধিকার ভোগ করবে। ২৯(২) ধারা অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, বংশ, ভাষা ইত্যাদি নির্বিশেষে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকলের প্রবেশাধিকার থাকবে।

৩০(১) ধারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দিয়েছে। ৩০(২) ধারা অনুসারে সরকারি আর্থিক সাহায্য দানের ব্যাপারে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানে ৩০(১) (ক) অনুচ্ছেদটি যুক্ত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র যদি কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে তাহলে অধিগ্রহণের আইনে এমন ব্যবস্থা থাকবে যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়।

মূল্যায়ন ঃ

ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে। বিভিন্ন ভাষাগত ও ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষার মাধ্যমেই ভারতের সাংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও কৃষ্টি রক্ষা করা সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যেই সংবিধানপ্রণেতারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারকে মৌলিক-অধিকাররূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই অধিকারটির স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারত রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রটি পরিস্ফুটিত হয়েছে। গণতন্ত্র বলতে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠকেই বোঝায় না। প্রকৃত গণতন্ত্র সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মনোভাব পোষণ করে। ভারতীয় গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত বিকাশের অধিকার মর্যাদা সহকারে স্বীকৃত হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব জাতীয় সংহতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

০৫.৭ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

কোনো দেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করলেই সেগুলি সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই অধিকারগুলি প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। অধ্যাপক পাইলি যথার্থই বলেছেন যে অধিকার বলবৎ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান বলতে কী বোঝায়?

ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা সংবিধানে কেবল মৌলিক অধিকারগুলিকেই লিপিবদ্ধ করেননি। এই মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্যও তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই অধিকারটি হল ভারতীয় নাগরিকদের একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র যদি বে-আইনিভাবে নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তবে নাগরিকরা কী কী প্রতিকার পেতে পারে এই অধিকারটিতে তার উল্লেখ করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানের ৩২-৩৪ নম্বর ধারায় শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে। ৩২ নম্বর ধারার চারটি অনুচ্ছেদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩২ নং ধারার বিশ্লেষণ ঃ

৩২(১) ধারায় বলা হয়েছে যে নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে প্রতিকারের জন্য সে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারবে।

৩২(২) ধারা নাগরিকের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে। সুপ্রিম কোর্ট এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারি করতে পারে। সংবিধান অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট যে লেখ-গুলি জারি করতে পারে সেগুলি হলো বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা এবং উৎপ্রেষণ।

আদালতের হাতে ন্যস্ত নির্দেশ বা লেখ সমূহের ব্যাখ্যা ঃ

'বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ' লেখ জারির মাধ্যমে আদালত বে-আইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেবার জন্য আটককারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারে।

'পরমাদেশ' জারি করার মাধ্যমে আদালত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে তার আইনানুগ কর্তব্যপালনের নির্দেশ দিতে পারে।

'প্রতিষেধ' হলো একটি লেখ যেটি ঊর্ধ্বতন আদালত কোনো নিম্নতন আদালতের ওপর জারি করতে পারে। এই লেখ জারি করার উদ্দেশ্য হলো নিম্নতর আদালতকে নিজ সীমার মধ্যে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া।

'অধিকার পৃচ্ছা' লেখটি সেই ব্যক্তির ওপর জারি করা হয় যিনি কোনো সরকারি পদে আইন সঙ্গত ভাবে নিযুক্ত না হয়েও সেই পদটি দাবি করেন। তিনি কোন্ অধিকারে পদটি দাবি করছেন এবং তাঁর দাবি বৈধ কিনা সেটি নির্ণয় করার জন্যই এই লেখটি জারি করা হয়।

'উৎপ্রেষণ' লেখটি কোনো নিম্ন আদালত, বিচারকার্যে নিযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান এবং কোনো পৌর

প্রতিষ্ঠানের ওপর জারি করা যায়। কোনো নিম্ন আদালত বা বিচারকার্যের ক্ষমতা যুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান নিজ ক্ষমতার সীমা লঙঘন করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এই লেখ জারি করে সেই ক্ষমতা বহির্ভূত সিদ্ধান্ত বাতিল করা যায় এবং নিম্নতন আদালত থেকে কোনো মামলা উর্ধ্বতন আদালতে তুলে নেওয়া যায়।

৩২ নম্বর ধারার - তৃতীয় অনুচ্ছেদটিতে পার্লামেন্টকে একটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেটি হল এই যে পার্লামেন্ট আইন তৈরি করে সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া অন্য যে কোনো আদালতকে নিজ এলাকার মধ্যে এই নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার ক্ষমতা দিতে পারে।

কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে এই অধিকারটি অকার্যকর থাকবে সেটি ৩২ নম্বর ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২ নম্বর ধারা সম্পর্কে অধ্যাপক পাইলি মন্তব্য করেছেন যে ৩২ নম্বর ধারার প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ আমাদের মৌলিক অধিকারগুলিকে প্রকৃত অধিকারে পরিণত করেছে। ৩২ নম্বর ধারার গুরুত্ব সম্পর্কে ডঃ আম্বেদকরের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি এই ধারাটিকে সংবিধানের আত্মরক্ষা এবং হৃদয় স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন।

সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্টগুলিরও এই সকল লেখ জারি করার অধিকার আছে কেবলমাত্র মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যেই নয়, অন্যান্য উদ্দেশ্যেও হাইকোর্টগুলি এই সকল লেখ জারি করার ক্ষমতার অধিকারী। তবে হাইকোর্টের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার মত ব্যাপক নয়। সুপ্রিম কোর্টের লেখ জারি করার ক্ষমতা সমগ্র ভারত ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। অপরদিকে হাইকোর্টের এই ক্ষমতা তার এক্তিয়ারের অধীনস্থ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৩৩ নং ধারা ঃ

সংবিধানের ৩৩ নম্বর ধারা অনুসারে জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনীর সদস্যরা শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার কতখানি ভোগ করতে পারবেন সেটি পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করে দেবে। ১৯৮৫ সালের ৫০ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে ৩৩ নম্বর ধারার এই বিধান সরকারি সম্পত্তির রক্ষিবাহিনীর সদস্য, গোয়েন্দা বিভাগ ও টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৩৪ নং ধারা ঃ

৩৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে যখন কোনো অঞ্চলে সামরিক আইন বলবৎ থাকে তখন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোনো কর্মচারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি সেই অঞ্চলে শৃঙ্খলা রক্ষা বা শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো অবৈধ কাজ করে তবে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে সেই কাজকে বৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। এই আইন দন্ডনিষ্কৃতি আইন বলে পরিচিত।

অধিকারটির সীমাবদ্ধতা ঃ

স্বাভাবিক অবস্থায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটি কার্যকর হলেও জরুরী অবস্থায় এই অধিকারটির

ওপর সংবিধানে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ৩৫৮ ধারা অনুযায়ী আপৎকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন করে অথবা শাসনবিভাগ আইন জারী করে ১৯ নম্বর ধারায় নাগরিকদের অধিকারগুলি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারে। ৩৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারির মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকারটি স্থগিত রাখতে পারেন। অর্থাৎ সেই সময়ে নাগরিক মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আদালতে আবেদন করতে পারেন না। জরুরী অবস্থার সময়েও কোনো আদেশ জারি করে ২০ এবং ২১ নম্বর ধারায় উল্লিখিত জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে স্থগিত রাখা যাবে না।

মূল্যায়ন ঃ

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার নাগরিকদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। এই অধিকারটির উপর নাগরিকদের অন্যান্য অধিকারগুলি ভোগের নিশ্চয়তা নির্ভর করে। কিন্তু এই অধিকারটির ওপর বিভিন্ন রকম বাধানিষেধ আরোপ করার ফলে বাস্তবে এই অধিকারটির গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে।

প্রথমত, জরুরী অবস্থার সময়ে এই অধিকারটি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময়ে একদিকে যেমন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, অপরদিকে তেমনই মৌলিক অধিকার রক্ষা করলে আদালতের ক্ষমতাও সীমিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, ভারতে কেবলমাত্র যুদ্ধের সময়ে নয়, শান্তির সময়েও বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ লেখ স্থগিত রাখা হয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেনে যুদ্ধের সময়ে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ লেখকে স্থগিত রাখা গেলেও স্বাভাবিক অবস্থায় সেটি করা যায় না।

তবে সংবিধান রচনাকালীন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকারটির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতার সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ভারতে এমন অনেক বিভেদকামী শক্তি কাজ করে চলেছে যেগুলি দেশের শান্তি, ঐক্য ও সংহতির পক্ষে অন্তরায়। এই বিভেদকামী শক্তিগুলির মোকাবিলা করার জন্য শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটির উপর বিধিনিষেধ আরোপের যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থরক্ষার মধ্যে সংবিধান প্রণেতারা দ্বিতীয়টির ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

০৫.৮ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ

অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অধিকারের মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত আছে। চীন দেশের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ দেখা যায়। জাপানের সংবিধানেও নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ আছে।

ভারতের মূল সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যের কোন উল্লেখ ছিল না। সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনের (১৯৭৬) মাধ্যমে নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে চতুর্থ

অধ্যায়-ক নামে একটি নতুন অধ্যায় এবং ৫১ (ক) নামে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করা হয়। এই ধারায় ভারতীয় নাগরিকের দশটি মৌলিক কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০২ সালের ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ৫১ (ক) ধারায় আরো একটি মৌলিক কর্তব্য সংযুক্ত হয়। তার ফলে এখন মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা দশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে এগার। এই মৌলিক কর্তব্যগুলি হল ঃ

(১) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে;

(২) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;

(৩) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(৪) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া দিতে হবে;

(৫) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণিগত বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;

(৬) আমাদের দেশের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্য প্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(৭) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে;

(৮) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার সাধন করতে হবে;

(৯) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে এবং

(১০) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

(১১) ২০০২ সালের ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে নতুন সামাজিক কর্তব্যটি হল 'ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে'। এটি হল মাতাপিতা বা অভিভাবকের মৌলিক কর্তব্য।

০৫.৯ রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬ থেকে ৫১ ধারার মধ্যে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ভারতকে একটি নিষ্ক্রিয় পুলিশীরাষ্ট্রে পরিণত না করে সক্রিয় জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনের

জন্যই নীতিসমূহের সংযোজন। কেবল রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রকে প্রসারিত করে এক বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হল ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নীতিগুলি কেন্দ্রের এবং রাজ্যের আইন ও শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং ভারতের অন্যান্য এলাকার সকল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ বিশেষ। বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র এই নীতিগুলিকে আইনে পরিণত করবে। নীতিগুলি হবে শাসন পরিচালনার মূল তত্ত্ব। দেশ শাসনের ক্ষেত্রে নীতিগুলি মৌলিক বলে গণ্য হবে। জি. এন. যোশী বলেছেন ঃ "The directive principles of state policy are fundamental in the governance of the country." সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূল ভিত্তি।

অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত নীতিসমূহ; (খ) শাসন কাঠামোর উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতিসমূহ; (গ) প্রগতিশীল রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত নীতিসমূহ এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতিসাধন সম্পর্কিত নীতিসমূহ। সংবিধানের ৩৬ থেকে ৫১ ধারার উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ রয়েছে। মূল সংবিধানে ছিল ১৩টি নির্দেশমূলক নীতি। ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে আরো ৪টি নীতি সংযুক্ত হয়।

(ক) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত নীতিসমূহ ঃ

(১) রাষ্ট্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করে জনকল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হবে (৩৮ ধারা)।

(২) রাষ্ট্র এমনভাবে তার নীতি পরিচালনা করবে যাতে (ক) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক পর্যাপ্ত উপজীবিকার অধিকার ভোগ করতে পারে; (খ) জনগণের কল্যাণে সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বণ্টিত হয়; (গ) সর্বসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে সম্পদ ও উৎপাদনের উৎসগুলি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত না হয়; (ঘ) একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান মজুরি পায়; (ঙ) পুরুষ ও নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তির বিরুদ্ধে কোনও কাজে যোগ দিতে বাধ্য না হয় (৩৯ ধারা)। ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে (১৯৭৬) আরো বলা হয়েছে যে স্বাস্থ্যসম্মত, মর্যাদাযুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশে শিশুরা যাতে বড় হয়ে উঠতে পারে এবং শৈশব ও যৌবন যাতে শোষণ ও দুঃখ-দুর্দশামুক্ত হয়, সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪২ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ৩৯ (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় আইন বলবৎ হবে। দীন-দরিদ্রদের জন্য নিখরচায় আইনের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করা হবে।

(৩) রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য জীবনধারণের উপযোগী মজুরি, সুন্দর জীবনযাত্রার মান, অবকাশ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবে; গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্প উন্নয়নের চেষ্টা করবে (৪৩ ধারা)।

৪৩(ক) ধারায় বলা হয়েছে যে শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সুযোগের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র।

(৪) জনগণকে বেকার, বার্ধক্য ও অসুস্থ অবস্থায় রাষ্ট্র সাধ্যমত চেষ্টা করবে (৪১ ধারা)।

(৫) রাষ্ট্র কাজের শর্তাদি মানবোচিত এবং প্রসূতিদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (৪২ ধারা)।

(খ) শাসন কাঠামোর উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতিসমূহ :

(১) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করবে (৪০ ধারা)।

(২) সরকারের বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করবার চেষ্টা করবে রাষ্ট্র (৫০ ধারা)।

(৩) রাষ্ট্র সমগ্র ভারতের সকল নাগরিকদের জন্য একই দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) প্রবর্তনের চেষ্টা করবে (৪৪ ধারা)।

(গ) প্রগতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত নীতিসমূহ :

(১) সংবিধান চালু হওয়ার দশবছরের মধ্যে বালক-বালিকারা যাতে ১৪ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে (৪৫ ধারা)।

(২) রাষ্ট্র ঔষধের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে মদ বা অন্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে (৪৭ ধারা)

(৩) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণির মানুষ বিশেষত তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক স্বার্থের উন্নতি ও তাদের সামাজিক অন্যায় ও অন্যান্য শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে (৪৬ ধারা)+

(৪) গাভি, গোবৎস প্রভৃতি হিতকারী গৃহপালিত পশু এবং অন্যান্য দুগ্ধবতী ও ভারবাহী পশু হত্যা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করবে (৪৮ ধারা)। ৪৮ (ক) ধারায় প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং বন ও বন্য প্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করবে।

(৫) চারু কলা ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্মারক স্থান ও বস্তু সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে (৪৯ ধারা)।

(ঘ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতিসাধন বিষয়ে নীতিসমূহ :

সংবিধানের ৫১ ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি, জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং সালিশীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদের মিমাংসার বিষয়ে রাষ্ট্র চেষ্টা করবে।

সমালোচনা ঃ

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে এই নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। সেই কারণে অনেক সমালোচক এই নীতিগুলিকে সংবিধান প্রণেতাদের 'সাধু ইচ্ছা' বলে বর্ণনা করেছেন। সমালোচকদের অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এই নীতিগুলি রূপায়ণের বাস্তব সময়সীমা না থাকায় নীতিগুলি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এই নীতিগুলিকে সংবিধানে ঘোষণা করা হলেও এগুলি কার্যকর করার জন্যে কোনো ব্যবস্থার কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়নি। নির্দেশমূলক নীতির সমালোচনায় আরও বলা হয় যে নীতিগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি এবং অনেকগুলি নীতিই অস্পষ্ট এবং পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট।

নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ

এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ের পরিপূরক বলা যেতে পারে। আমরা জানি যে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে যে মৌলিক অধিকারগুলি ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলির মাধ্যমে নাগরিক জীবনে পূর্ণ অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সামাজিক এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

সাংবিধানিক উপায়ে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়াই হলো নির্দেশমূলক নীতিগুলির লক্ষ্য। সেই দিক থেকে বিচার করলে নীতিগুলির গুরুত্বকে উপলব্ধি করা যায়।

স্যার বি.এন.রাও বলেন যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি নৈতিক নির্দেশ হিসাবে নির্দেশমূলক নীতিগুলির শিক্ষাগত মূল্য আছে। এই নীতিগুলি শাসকগোষ্ঠীকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির আদর্শগত মূল্যও অপরিসীম। জাতির জীবনে অনুসরণযোগ্য আদর্শ তুলে ধরার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় কতকগুলি উচ্চ আদর্শের ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য না হলেও এই নীতিগুলির রাজনীতিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। এই নীতিগুলি দেশ শাসনের ব্যাপারে অপরিহার্য বলে ঘোষিত হয়েছে। ডঃ আম্বেদকরের মতে, কোনো সরকার এই নীতিগুলিকে অবহেলা করলে তাকে নির্বাচনের সময় অবশ্যই নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেই কারণে ডঃ দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন যে এই নীতিগুলির পিছনে যে শাস্তি নিহিত আছে সেটি রাজনীতিক।

নির্দেশমূলক নীতিগুলির সাংবিধানিক গুরুত্ব অবশ্যই আছে। সংবিধানের ৩৫৫ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রের

কর্তব্য হলো রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখা। নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের অঙ্গ। সংবিধানের ৩৭ ধারা অনুযায়ী আইনপ্রণয়নে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

অধ্যাপক পাইলির (M. V. Pylee) মতে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি ভারতের জনসাধারণের ন্যূনতম আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই নীতিগুলি রূপায়ণের মাধ্যমেই ভারত একটি প্রকৃত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য না হলেও আদালতেও এই নীতিগুলির গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে বিহার রাজ্য বনাম কামেশ্বর সিং (১৯৫২), কেরালা শিক্ষা বিল (১৯৫৮) প্রভৃতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করা যায়।

আন্তর্জাতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলেও এই নীতিগুলির বিশেষ তাৎপর্য আছে। নীতিগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায় যে উনিশ শতকের প্রচলিত 'পুলিশী রাষ্ট্র'এর ধারণা অনুযায়ী ভারতের সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেননি। ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে তাঁরা রাষ্ট্রের কতকগুলি ইতিবাচক কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে সেই ইতিবাচক কার্যাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

০৫.১০ সারাংশ

অধিকার হলো মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপযোগী কিছু সুযোগসুবিধা। মানুষের জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য অধিকারগুলি হল মৌলিক অধিকার। ভারতের সংবিধানের ১৪-১৮ ধারায় সাম্যের অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের ভূখণ্ডের ভেতরে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে সমতা বা আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকারকে অস্বীকার করবে না। ১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, জন্মস্থান, নারী-পুরুষ ইত্যাদির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এই ধারার ব্যতিক্রম হল নারী, শিশু, সামাজিক ও আর্থনীতিক দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণি এবং তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিসমূহ। এদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। ১৬ নম্বর ধারায় সরকারি চাকরির অধীনে নাগরিকদের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তবে এই অধিকারের ব্যতিক্রম এই যে পার্লামেন্ট কোনো রাজ্যের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে ওই রাজ্যে বসবাসগত যোগ্যতা আরোপ করতে পারে। তাছাড়া অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকদের জন্য পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আবার কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত চাকরি বা পদকে সেই বিশেষ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা যায়। সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতা আচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৮ নম্বর ধারায় কৃত্রিম বিভেদমূলক উপাধি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয়

সংবিধানে উল্লিখিত সাম্যের অধিকার হল মূলত একটি রাজনীতিক ও আইনগত অধিকার। আর্থনীতিক সাম্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া যথার্থ সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন।

ভারতীয় সংবিধান স্বাধীনতার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। সংবিধানের ১৯-২২ ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ আছে। মূল সংবিধানে ১৯ নম্বর ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল সাতটি অধিকার। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের পর সাতটির জায়গায় ছ'টি অধিকার আছে। এই অধিকারগুলি হল বাক্য ও মতপ্রকাশের অধিকার, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার অধিকার, সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার, ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার, ভারতের ভূখণ্ডের যে-কোনো অংশে বসবাসের অধিকার এবং যে-কোনো বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই অধিকারগুলির বিশেষ মূল্য আছে। তবে ১৯ নম্বর ধারায় উল্লিখিত অধিকারগুলি অবাধ নয়। সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপের কথা বলা হয়েছে। বাধা নিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত কিনা আদালত সেটি বিচার করতে পারে। ২০ নম্বর ধারায় অপরাধীর দণ্ডবিধানের ব্যাপারে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ২১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ২২ ধারায় গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকার অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ। আদালত স্বাধীনতার অধিকারের ওপর বাধানিষেধের পদ্ধতিগত দিকটি বিচার করতে পারলেও ন্যায়নীতির দিক থেকে বিধিনিষেধগুলি কতদূর বৈধ সেটি বিচার করতে পারে না। ভারতের ধনবৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অধিকারের সার্থক প্রয়োগ আশা করা যায় না।

গণতান্ত্রিক আদর্শের সার্থক রূপায়ণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজের বুক থেকে শোষণের অবসান দরকার। ভারতীয় সংবিধানের ২৩ ও ২৪ ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ২৩ ধারায় মানুষ বেচাকেনা, বেগার খাটানো এবং বলপূর্বক পরিশ্রম করানো নিষিদ্ধ হয়েছে। ২৪ ধারা অনুযায়ী চোদ্দ বছরের কম বয়সি শিশুদের কারখানা, খনি বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের জন্য সমাজে আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

বিশ্বমানবতাবোধ ধর্মের মূল নীতি হলেও ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে বিভেদের ঘটনা বিরল নয়। ভারতেও স্বাধীনতার প্রাক্কালে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই ভারতকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করা হয়। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় স্থান পেয়েছে। সংবিধানের ২৫-২৮ ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ আছে। ২৫ ধারায় ব্যক্তিকে বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তবে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

অবাধ নয়। ২৬ ধারায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও কতকগুলি অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো বিশেষ ধর্মের প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কোনো ব্যক্তিকে করপ্রদানে বাধ্য করা যাবে না। ২৮ নম্বর ধারায় সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যকরণ নিষিদ্ধ করেও সংবিধানের অন্যান্য কয়েকটি ধারায় কতকগুলি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। তবে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে সার্থক করে তোলার জন্যে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে ওঠা দরকার।

ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নাগরিকদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ ধারায় অধিকারটির উল্লেখ আছে। ২৯ ধারায় ভারতের নাগরিকদের যে কোনো অংশকে নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও লিপি ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ৩০ ধারায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারত রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রটি পরিস্ফুটিত হয়েছে। সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি সংযোজিত হয়েছে। সংবিধানের ৩২ ধারা অনুসারে মৌলিক আধারগুলি বলবৎ করার জন্যে নাগরিক সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারে। মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে সুপ্রিমকোর্ট বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রমুখ আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারী করতে পারে। ২২৬ ধারায় হাইকোর্টগুলিকেও এই লেখ জারী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। জরুরী অবস্থার সময় শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি স্থগিত থাকে। তবে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে জরুরী অবস্থাতেও ২০ এবং ২১ ধারার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে স্থগিত রাখা যায় না। সংবিধানের ৩৩ ধারায় বলা হয়েছে যে জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনীর সদস্যরা এই অধিকার কতটা ভোগ করবেন সেটি পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করবে। ৩৪ ধারায় দণ্ডনিষ্কৃতি আইনের কথা বলা হয়েছে। ৩৫৮ এবং ১৫৯ ধারায় অধিকারটির সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে।

মূল ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ ছিল না। ৪২তম সংবিধান সংশোধনে মৌলিক কর্তব্যগুলি সংযোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কর্তব্যগুলির মধ্যে সংবিধানকে মান্য করা, ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা করা, জাতীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রসারিত করা, প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন, জাতীয় সম্পত্তির সংরক্ষণ প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। তবে এই কর্তব্যগুলি সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতির অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬-৫১ ধারায় রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতিসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে দেশ শাসন এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নীতগুলি মেনে চলা রাষ্ট্রের কর্তব্য। বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে নীতিগুলিকে কতকগুলি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। তবে এই নীতিগুলি

আদালতে বলবৎযোগ্য না হওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এগুলি উপেক্ষিত হয়েছে কিংবা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এজন্য ক্ষমতাসীন সরকার সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু নীতিগুলি মূল্যহীন নয়। রাজনীতিক, আর্থনীতিক, আইনগত, সাংবিধানিক এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে নীতিগুলির প্রভূত গুরুত্ব। এই নির্দেশমূলক নীতিগুলি কার্যকর করার মাধ্যমেই ভারত একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য না হলেও ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যসরকার নীতিগুলি রূপায়ণের ব্যাপারে যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জমিদারী অধিগ্রহণ, ভূমিসংস্কার সাধন, কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, ব্যাঙ্ক ও বীমা জাতীয়করণ, রাজন্যভাতার বিলোপ প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন, একই ধরনের দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উদ্যোগী ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়। শ্রমিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। কুটির শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৪ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষাদান, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারেও যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

০৫.১১ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত সাম্যের অধিকারটির সমালোচনা মূলক বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

২। (ক) ভারতীয় সংবিধানের কোন্ কোন্ ধারায় সাম্যের অধিকারের উল্লেখ আছে?

(খ) ভারতের সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

(গ) ১৬ নম্বর ধারায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমতার অধিকারের ব্যতিক্রমগুলি কী কী?

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উপাধি প্রদান স্বীকৃতি হয়েছে?

স্বাধীনতার অধিকার

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ভারতের সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় উল্লিখিত স্বাধীনতার অধিকারটি ব্যাখ্যা কর।

২। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত স্বাধীনতার অধিকারটি বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় উল্লিখিত অধিকারগুলি কী কী?

২। কবে এবং কোন্ সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ দেওয়া হয়?

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ঃ

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের উপর একটি টীকা লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সংবিধানের কোন্ কোন্ ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের উল্লেখ আছে?

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ঃ

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ কোন্ কারণে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে?

শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার ঃ

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতীয় সংবিধানের কোন্ কোন্ ধারায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারের উল্লেখ আছে?

২। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত ৩০(১) (ক) ধারায় কী বলা হয়েছে?

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ঃ

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্যে সুপ্রিম কোর্ট কী কী ধরনের নির্দেশনামা জারি করতে পারে?

কর্তব্য ঃ

(১) ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

নির্দেশমূলক নীতি ঃ

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি বর্ণনা কর।

২। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মধ্যে যে কোনো চারটি নীতির উল্লেখ কর।

০৫.১২ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Johari, J.C — Indian Govt and Politics, Vishal Publications. Delhi-Jalandhar.

(২) Kashyap, Subhas — Our Constitution, National Book Trust India, New Delhi.

(৩) Austin, Granville — The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation, Oxford University Press, London.

(৪) দুর্গাদাস বসু — ভারতের সংবিধান পরিচয়, প্রেন্টিস হল অফ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী।

(৫) নিমাই প্রামাণিক — ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা।

(৬) অনাদিকুমার মহাপাত্র — ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।

একক ০৬ ❐ ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনবিভাগ

গঠন

০৬.১ উদ্দেশ্য

০৬.২ প্রস্তাবনা

০৬.৩ ভারতের রাষ্ট্রপতি

০৬.৪ ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

০৬.৫ রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ও পদচ্যুতি

০৬.৬ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

০৬.৭ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

০৬.৮ রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

০৬.৯ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

০৬.১০ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা

০৬.১১ প্রধানমন্ত্রী, বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা

০৬.১২ সারাংশ

০৬.১৩ অনুশীলনী

০৬.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

০৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি হলো ভারতের শাসন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা। স্বাধীন ভারতে কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে সে সম্পর্কে সংবিধান রচনার সময়ে গণপরিষদে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার ভিত্তিতে ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে তিনি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তাঁর নামে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই। তাঁকে মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করতে হয়। শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রীসভার হাতে ন্যস্ত। এই এককটিতে রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির পদ্ধতি সম্পর্কেও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এককটিতে বিশদ আলোচনা আছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে। রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এই এককটি পড়লে আমরা উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণালাভ

করতে পারবো। এককটিতে কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠন, কার্যাবলী সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। সর্বোপরি ভারতের প্রকৃত শাসকপ্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কেও এককটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

০৬.২ প্রস্তাবনা

এই এককের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনবিভাগের সঙ্গে আপনার পরিচয় স্থাপন। এককটি পাঠ করলে আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন।

- ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, কার্যকাল, পদচ্যুতি, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা এবং জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা।
- ভারতের উপরাষ্ট্রপতির আলোচনা।
- কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা।

০৬.৩ ভারতের রাষ্ট্রপতি

ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কাজ করেন।

০৬.৪ ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবেন। ভারতের সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতিও নির্বাচিত হন। তবে তিনি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন না। ভারতের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতীয় সংবিধানের ৫৪ এবং ৫৫ ধারায় এ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

রাষ্ট্রপতির পদের জন্যে প্রার্থী হতে হলে কতকগুলি যোগ্যতার দরকার। প্রথমত, প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁকে কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। তৃতীয়ত, তাঁকে লোকসভার সদস্য হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। চতুর্থত, তিনি কেন্দ্রীয় বা কোনো রাজ্য আইনসভার সদস্য হবেন না। পঞ্চমত, তিনি রাষ্ট্রের অধীনে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের জন্যে একটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সকল সদস্য এবং অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচিতমণ্ডলী গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। প্রথমত, অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব যথাসম্ভব একই হারে হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, ইউনিয়ন এবং অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ভোটের সমতা রক্ষিত

হওয়া দরকার। রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হতে হলে কোনো প্রার্থীকে মোট প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশি পেতে হবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্যে যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয় সেটি একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিটি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার জন্যে কতকগুলি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

প্রথমত, প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা একটি হলেও বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের মূল্য বিভিন্ন ধরনের হয়। এই মূল্য নির্ধারণের জন্যে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেটি হল এই যে প্রত্যেক রাজ্যের জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। এই ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যায় সেটিই হবে সেই রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা। মনে রাখতে হবে যে ১০০০ দিয়ে ভাগ করার সময়ে ভাগশেষ যদি ৫০০ বা তার বেশি হয় তবে ভাগফলের সঙ্গে এক (১) যোগ করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ধারণ। সেটি নির্ধারণের জন্যে সকল রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের ভোটের মোট সংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ ভাজক সংখ্যার সমান বা তার বেশি হলে ভাগফলের সঙ্গে এক (১) যোগ করতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়ে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়। ব্যালটপত্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীর নামের তালিকা থাকে। ভোটদাতারা সর্বাধিক পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে ১ সংখ্যাটি লিখবেন। এইভাবে পছন্দ অনুসারে তাঁরা বিভিন্ন প্রার্থীর নামের পাশে ২,৩,৪,৫ প্রভৃতি সংখ্যা বসাবেন। ভোটদাতাদের পক্ষে সবগুলি পছন্দ জানাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে প্রথম পছন্দের ভোট না জানালে ব্যালটপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

চতুর্থ পর্যায়টি হলো ভোট গণনা এবং কোটা নির্ধারণের পর্যায়। কোটা নির্ধারণের জন্যে সকল নির্বাচনপ্রার্থীর প্রথম পছন্দের বৈধ ভোটসংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগ ফলের সঙ্গে ১ যোগ করতে হয়। প্রথম গণনায় কোনো প্রার্থী এই কোটা অথবা তদূর্ধ্ব ভোট পেলে তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে।

কোটা-সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট কোনো প্রার্থী নাও পেতে পারেন। তখন যে প্রার্থীর প্রথম পছন্দের ভোট সংখ্যা সব থেকে কম তাঁকে বাদ দিতে হবে। এবার তাঁর ব্যালট পত্রের দ্বিতীয় পছন্দের ভোটগুলিকে অন্যান্য প্রার্থীদের কাছে হস্তান্তরিত করতে হবে। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রার্থী নির্বাচিত না হন ততক্ষণ পর্যন্ত ভোট হস্তান্তর চলতে থাকে।

সমালোচকদের মতে, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি অতিমাত্রায় জটিল। দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতার তুলনায় দলীয় রাজনীতিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জুলাই ২০১২ সালে

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ইউ. পি. এ (ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স) জোট-২ সরকার এবং বিরোধী জোট এন. ডি. এ (ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স) যথাক্রমে প্রণব মুখার্জী ও পি. এ. সাংমাকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য এবং হামিদ আনসারিকে (দ্বিতীয় বারের জন্য) ও যশবন্ত সিংকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনীত করেছিল। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরোক্ষ পদ্ধতিতে হয়, কিন্তু এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় রাজনীতির প্রকাশ প্রায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মত লক্ষ্য করা গেছে। অনেকে মনে করেন ২০১২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অভূতপূর্ব দলীয় প্রচার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছোট ছোট আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের কাছে নির্বাচন প্রার্থীদের ভোট প্রার্থনা ইত্যাদি রাষ্ট্রপতি পদের সম্মানের অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে। একথা ঠিক যে পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়া কোনও প্রার্থীর পক্ষে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এত হৈ চৈ, এত নির্বাচনী সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব নিকাশ দেখা গিয়েছে।

যাইহোক, রাজনৈতিক প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রণব মুখার্জী ভারতের ১৩ তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং ৭ আগস্টের উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হামিদ আনসারি দ্বিতীয়বারের জন্য উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। অতীতে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণও দ্বিতীয় বার উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন ছাড়া কোনো প্রার্থীর পক্ষে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের মতানুসারে কোনো রাজ্য বিধানসভা বাতিল থাকাকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই ব্যবস্থাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে।

০৬.৫ রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ও পদচ্যুতি

ভারতের রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরের কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও নতুন রাষ্ট্রপতি যতদিন কার্যভার গ্রহণ না করেন ততদিন পর্যন্ত পূর্বতন রাষ্ট্রপতি নিজ পদে বহাল থাকেন। কোনো রাষ্ট্রপতি পুনরায় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম হল, কোনো ব্যক্তি মোট দুবার রাষ্ট্রপতির পদের জন্যে প্রার্থী হতে পারেন। ভারতের সংবিধানে এ সম্পর্কে বাঁধাধরা কোনো নিয়মের উল্লেখ নেই।

রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার আগেই পদত্যাগ করতে পারেন। আবার পার্লামেন্ট সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে পারে। পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ আনতে পারে। অভিযোগ উত্থাপনের জন্যে ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হয়। যে কক্ষে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় সেই কক্ষে যতজন সদস্য থাকেন তাঁদের অন্তত এক চতুর্থাংশ সদস্য এই নোটিশটিতে স্বাক্ষর করবেন। এর পরে রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির প্রস্তাবটি নিয়ে কক্ষটিতে আলাপ-আলোচনা চলে। প্রস্তাবটিতে যদি কক্ষের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সম্মতি দেন তবে প্রস্তাবটিকে পার্লামেন্টের অপর কক্ষে পাঠানো হয়। অপর কক্ষ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের

অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে। এই কক্ষের সদস্যদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে সমর্থন করেন তবে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন। রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির পদ্ধতিটি ইমপিচমেন্ট পদ্ধতি নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির পদ্ধতির সমালোচনায় বলা হয় যে এই পদচ্যুতির ব্যাপারে রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের অংশগ্রহণের কোনো অধিকার নেই। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টে যে সমস্ত সদস্য মনোনীত হন তাঁরা রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে এঁদের কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি পদচ্যুত হবেন। কিন্তু সংবিধান লঙ্ঘন বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায় সে সম্পর্কে সংবিধানে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

০৬.৬ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

ভারতে কেন্দ্রের শাসন বিভাগের শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। তবে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি হলেন একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান। তাঁর নামে শাসন বিভাগীয় কার্যাদি সম্পাদিত হলেও বাস্তবে তিনি শাসন পরিচালনা করেন না। কার্যক্ষেত্রে শাসন পরিচালনা করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ। এই মন্ত্রীপরিষদ লোকসভার কাছে দায়ী থাকে। রাষ্ট্রপতি এই মন্ত্রী-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর সংবিধানিক ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করেন।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেগুলিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগ করা যায়, যথা (ক) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (গ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, (ঘ) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা এবং (ঙ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা।

(ক) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা - ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ ধারায় কেন্দ্রের শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকর্মের পরিধি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। সংসদ যে সমস্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং যে সমস্ত বিষয়ে ভারত সরকার চুক্তি সম্পন্ন করার ক্ষমতা ভোগ করে সেই সমস্ত বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের এক্তিয়ার প্রসারিত। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে সেই সকল বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন বা করতে পারেন।

সংবিধানের ৫৩(১) ধারায় বলা হয়েছে যে কেন্দ্রের শাসন বিভাগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে সংবিধান অনুযায়ী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

সংবিধান অনুসারে ভারত সরকারের শাসন পরিচালনাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। এ সম্পর্কে কোনো সংবাদ বা তথ্য রাষ্ট্রপতি জানতে চাইলে তাঁকে সেটি জানাতে হয়।

কোনো বিশেষ বিষয়ে কোনো মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে মন্ত্রী-পরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে অন্যতম হল তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা। তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিযুক্ত করেন। এটর্নি জেনারেল, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ, প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণ, নির্বাচন কমিশনার, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল প্রমুখ উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন নিয়োগের ক্ষমতা আছে। এগুলির মধ্যে নির্বাচন কমিশন, অর্থ কমিশন, আন্তঃরাজ্য কমিশন প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য।

নিয়োগ-সংক্রান্ত ক্ষমতার পাশাপাশি সংবিধান কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি মন্ত্রী-পরিষদের যে কোনো সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন। ভারতের এটর্নি জেনারেল এবং রাজ্যপালদের পদচ্যুতির ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। তিনি প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতির নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের পদচ্যুত করতে পারেন। আবার সংসদের প্রস্তাব অনুসারে তিনি প্রধান ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি এবং নির্বাচন কমিশনার ও ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষককে অপসারণ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, তাঁর সামরিক ক্ষমতা। তিনি ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ভারতের স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীর প্রধানদের তিনি নিয়োগ করেন। তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান। যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি স্থাপন তিনিই করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর নেই। সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে কার্য পরিচালনা করতে হয়।

রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত হল তাঁর পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ক্ষমতা। ভারত সরকারের কূটনীতিক কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। তিনি ভারতীয় কূটনীতিক প্রতিনিধিদের বিদেশে প্রেরণ করেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতদের পরিচয়পত্র তিনিই গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির নামে আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদিত হয়। তবে সেগুলি কার্যকর করার জন্য সংসদের অনুমোদন (ratification) প্রয়োজন হয়।

শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির কিছু তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা আছে। সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত অঞ্চলগুলির শাসনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি বা তাঁর মনোনীত কোনো শাসকের হাতে ন্যস্ত। তিনি তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের কল্যাণের জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে পারেন। অঙ্গরাজ্য সমূহের শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে সহযোগিতা স্থাপনের জন্য একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে।

(খ) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার রীতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাষ্ট্রপতির আইন-বিষয়ক ক্ষমতার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলো সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত ক্ষমতা। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে

পারেন। তিনি সংসদের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি লোকসভার অধিবেশন ভেঙে দিতে পারেন।

সংসদ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হল ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণের ক্ষমতা। তিনি সংসদের যে কোনো কক্ষে বা উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি বর্ণনা করেন। তিনি সংসদে আলোচ্য কোন সম্পর্কে বাণী প্রেরণ করতে পারেন। কোনো বিষয়ে সংসদের উভয় কক্ষের মতানৈক্যের অবসান ঘটানোর জন্য তিনি উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির আইনসভায় সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা আছে। তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে ১২ জন ব্যক্তিকে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় মনোনীত করতে পারেন। আবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয়দের প্রতিনিধি উপযুক্ত সংখ্যক হয়নি বলে মনে হলে তিনি ওই সম্প্রদায় থেকে দুজন সদস্য লোকসভায় মনোনয়ন করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে অন্যতম হল বিলে সম্মতি প্রদানের ক্ষমতা। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিলকে আইনে পরিণত করতে হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিলে তিনি সম্মতি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটিকে সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু সংসদ যদি পুনরায় বিলটি অনুমোদন করে তবে রাষ্ট্রপতি সেই বিলে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। অর্থবিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো যায় না। আবার সংবিধান সংশোধনী বিলে সম্মতি দেওয়া রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক।

রাজ্যের আইনসভার বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা আছে। অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় গৃহীত কোনো বিলকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সেই বিলে সম্মতি দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। তিনি বিলটিকে পুনরায় বিবেচনা করার জন্য রাজ্য আইনসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। সেখানে বিলটি পুনরায় গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে অস্বীকার করলে বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন অথবা রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত কোনো বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হয়। আবার অর্থবিল এবং রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থব্যয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে কোনো বিল রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন ছাড়া সংসদে পেশ করা যায় না।

সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা দিয়েছে। সংসদের অধিবেশন যখন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রের আইন সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন জারি করতে পারেন। এই অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন পার্লামেন্টের আইনের মতই কার্যকর হয়। পার্লামেন্ট পুনরায় অধিবেশনে বসার তারিখ থেকে ছ'সপ্তাহ পর্যন্ত এই অর্ডিন্যান্স কার্যকর থাকে। পার্লামেন্ট অনুমোদন না করলে এই অর্ডিন্যান্স বাতিল হয়ে যায়। আবার রাষ্ট্রপতি নিজেও এটি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

কয়েকটি রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে। গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী এবং কমিশনের কিছু প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে সংসদে উপস্থাপিত হয়। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, অর্থ কমিশন, ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য নিযুক্ত বিশেষ কর্মচারীর প্রতিবেদন প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য।

(গ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য সরকারের আয়-ব্যয়ের বিবরণী বা বাজেট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মারফত সংসদে ছাড়া কর বা ঋণসংক্রান্ত প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করা যায় না। সংবিধান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি একটি অর্থ কমিশন গঠন করবেন। এই কমিশনের কাজ হলো কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতির বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে তাঁর ক্ষমা-প্রদর্শনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখা, হ্রাস করা বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন।

(ঙ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে তিন ধরনের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যথা (১) জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা, (২) অঙ্গরাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা এবং (৩) আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা।

০৬.৭ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে সংবিধানবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো দেশে কী ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ওপর সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পদমর্যাদা অনেকখানি নির্ভর করে। ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থার মূল নীতি অনুসারে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা সংসদের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার হাতে ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রী-পরিষদের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। রাষ্ট্রপতি, রাজা বা রানির নামে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হলেও তিনি বা তাঁরা কার্যক্ষেত্রে দেশের শাসন পরিচালনা করেন না। গণপরিষদে ডঃ আম্বেদকর মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতি শব্দটি ব্যবহৃত হলেও ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার অনুরূপ নয়। ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ইংল্যান্ডের রাজা বা রানির পদমর্যাদার সঙ্গে তুলনীয়। তিনি রাজত্ব করবেন, কিন্তু দেশ শাসন করবেন না। টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, আল্লাদী কৃষ্ণ-স্বামী আয়ার, জওহরলাল নেহরু প্রমুখেরাও একই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে রাষ্ট্রপতিকে নামসর্বস্ব শাসকে পরিণত করাই ছিল সংবিধান-প্রণেতাদের লক্ষ্য।

সংবিধানের ৭৪(১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্য সম্পাদনে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য (to aid and advise) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে। সংবিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রী-পরিষদই লোকসভার কাছে দায়ী। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে সংবিধান শাসন পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রীসভার হাতেই ন্যস্ত করেছে।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীসভা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন না। সুতরাং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির দিক থেকে বিচার করলে মন্ত্রী-পরিষদই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।

তৃতীয়ত, লোকসভার আস্থাভাজন কোনো মন্ত্রীসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করলে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করবেন।

চতুর্থত, সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া হলেও এই ক্ষমতা ব্যবহার করে রাষ্ট্রপতি কখনই একনায়কে পরিণত হতে পারেন না। ৪৪তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে মন্ত্রীসভার প্রস্তাবের লিখিত অনুলিপি ছাড়া রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা জারী করতে পারেন না।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রপতি দেশের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেও তাঁর সামরিক ক্ষমতা সংসদের আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ষষ্ঠত, প্রশাসনিক নীতি ও কার্য পরিচালনা সম্পর্কে মন্ত্রী-পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য। এর থেকে বোঝা যায় যে মন্ত্রী-পরিষদই হল প্রশাসনিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতের বিচার বিভাগও রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলে অভিমত-প্রকাশ করেছে। রামজাওয়া কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলা (১৯৫৫), *শামসের সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলা* (১৯৭৪) প্রভৃতিতে সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত প্রদান করেছে যে রাষ্ট্রপতি হলেন আনুষ্ঠানিক বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক। শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে যে বিতর্কের অবকাশ ছিল সংবিধানের ৪২তম এবং ৪৪তম সংশোধনের মাধ্যমে সেটির অবসান ঘটেছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ পুনর্বিবেচনার জন্যে ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রীসভা যদি আবার সেই একই পরামর্শ দ্বিতীয়বার প্রেরণ করে তবে রাষ্ট্রপতি সেই পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য থাকবেন।

তবে ভারতের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিছক নামসর্বস্ব শাসক নন। জাতির প্রতীক হিসাবে তিনি মন্ত্রীসভাকে পরামর্শ দিতে পারেন, উৎসাহিত করতে পারেন এবং সতর্ক করে দিতে পারেন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাঁর বিশেষ কোনো ভূমিকা না থাকলেও বিশেষ কোনো রাজনীতিক পরিস্থিতিতে তাঁর পদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

০৬.৮ রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

দেশের অস্বাভাবিক বা সংকটজনক পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সংবিধান রচয়িতারা ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করেছেন। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টাদশ অংশে ৩৫২

থেকে ৩৬০ ধারার মধ্যে রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার আলোচনা আছে। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন, যথা (ক) আপৎকালীন জরুরী অবস্থা, (খ) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা এবং (গ) আর্থিক জরুরী অবস্থা।

(ক) জাতীয় জরুরী অবস্থার ঘোষণা ঃ সংবিধানের ৩৫২ ধারায় জাতীয় অবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। মূল সংবিধানে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ভারত বা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে বা বিঘ্নিত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে তাহলে তিনি জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনে 'আভ্যন্তরীণ গোলযোগ' শব্দগুলির বদলে 'সশস্ত্র বিদ্রোহ' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিলে বা দেখা দেওয়ার আশংকা থাকলে রাষ্ট্রপতি সারা ভারত বা ভারতের যে-কোনো অংশে জরুরী অবস্থা জারি করতে পারেন। ৪৪তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত বিবেচনা বা সন্তুষ্টির ওপর কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার লিখিত অনুলিপি ছাড়া রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন না।

জাতীয় জরুরী অবস্থার ঘোষণা পার্লামেন্টের প্রত্যেক কক্ষের সদস্যদের অর্ধেক এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের দ্বারা এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত হতে হবে। এইভাবে অনুমোদিত হলে জরুরী অবস্থার ঘোষণা ছ'মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকে। সংসদের উভয়কক্ষে জরুরী অবস্থার ঘোষণা যদি আবার অনুমোদিত হয় তবে এই ঘোষণা আরও ছ'মাস বলবৎ থাকতে পারে।

জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিলে রাজ্য সেই নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবে।

দ্বিতীয়ত, সংবিধান অনুসারে জরুরী অবস্থায় রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেন্টের থাকবে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে কেন্দ্র-রাজ্য রাজস্ববণ্টনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে পারেন।

চতুর্থত, লোকসভার মেয়াদের উপরেও জরুরী অবস্থার প্রভাব লক্ষণীয়। জরুরী অবস্থায় লোকসভার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। আবার পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজ্যের বিধানসভার কার্যকালও একবছর পর্যন্ত বাড়াতে পারে।

পঞ্চমত, জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকা কালে সংবিধানের ৩৫৮ এবং ৩৫৯ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি

বিশেষ ঘোষণাবলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত রাখতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ঘোষণা বলে নাগরিকের আদালতে আবেদন করার অধিকারও অকার্যকর থাকে।

(খ) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা ঃ সংবিধানের ৩৫৬ ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো রাজ্যের রাজ্যপালের কাছ থেকে অথবা অন্য কোনো সূত্রে রাষ্ট্রপতি যদি জানতে পারেন যে সেই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে না তাহলে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। ১৯৭৮ সালের সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে কোনো রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণা করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত বা সন্তুষ্টিই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে না। এ বিষয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে।

রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা পার্লামেন্টের দুটি কক্ষে পৃথক ভাবে অনুমোদিত হতে হবে। দুইমাসের মধ্যে এই অনুমোদন হওয়া দরকার। নতুবা দুইমাস পরে এই ঘোষণা অকার্যকর হয়ে যাবে। পার্লামেন্টের অনুমোদন পেলে এই ঘোষণা প্রথমে ছ'মাস এবং পার্লামেন্ট অনুমোদন করলে এটি আরও ছ'মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষিত হলে সেই রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি নিজে গ্রহণ করতে পারেন। আবার তিনি রাজ্যপাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে এই দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারেন।

আবার কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হলে পার্লামেন্ট সেই রাজ্যের জন্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে অথবা আইন করে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি আবার সেই আইন অনুযায়ী অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে এই ক্ষমতা ন্যস্ত করতে পারেন।

রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষিত হলে রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেওয়া বা স্থগিত রাখার জন্যে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারী করতে পারেন। তবে এই ঘোষণা দ্বারা রাজ্যের হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতার কোনোরকম পরিবর্তন করা যায় না।

(গ) আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা ঃ সংবিধানের ৩৬০ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার ফলে ভারত বা তার কোনো অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে পারে তা হলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। সংবিধানের ৩৮তম সংশোধনী আইনে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে ধরা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয়।

আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে দুমাসের মধ্যে অনুমোদিত না হলে ঘোষণাটি অকার্যকর হয়ে যাবে। পার্লামেন্টের দ্বারা অনুমোদিত হলে ঘোষণাটি অনির্দিষ্টকাল বলবৎ থাকতে পারে।

আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ভাবে বলবৎ হয়।

. এই সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা এবং সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতির বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায়।

মূল্যায়ন

ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সাংবিধানিক ব্যবস্থা বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

প্রথমত, জাতীয় জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। এই ব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, মন্ত্রীসভার নির্দেশ অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষণার বর্তমান ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধির পথকে পরোক্ষভাবে প্রশস্ত করেছে বলে অনেকে মনে করেন।

অনুরূপভাবে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার ঘোষণাও নানা দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথমত, রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে রাজ্যে শাসন এবং আইনবিষয়ক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে এই ধরনের ব্যবস্থা অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, সংবিধান রচয়িতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্যের প্রশাসনিক অচলাবস্থা দূর করার শেষ প্রতিকার হিসেবে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা দরকার। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে একাধিকবার রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেছে। সমালোচকদের মতে, রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক।

অনুরূপভাবে বলা যায় যে আর্থিক অবস্থার ঘোষণা রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী হতে পারে।

তবে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সাংবিধানিক ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায় যে এই ব্যবস্থার বাস্তব উপযোগিতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহের কার্যকারিতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক এই অভিযোগও সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ রাষ্ট্রপতি এককভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। জরুরী অবস্থা ঘোষণার জন্যে ক্যাবিনেটের লিখিত পরামর্শের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া জরুরী অবস্থা বেশি দিন বলবৎ থাকে না। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কেও বলা যায় যে সমগ্র দেশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা অঙ্গরাজ্যগুলির প্রশাসনিক সাফল্যের উপর নির্ভর করে। রাজ্যগুলি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে স্বভাবতই কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার

দেশে আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করার জন্যে আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

০৬.৯ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি :

ভারতীয় সংবিধানের ৬৩ নম্বর ধারায় উপরাষ্ট্রপতির পদের উল্লেখ আছে। ভারতের রাষ্ট্রপতির মত উপরাষ্ট্রপতিও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলী এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে।

উপরাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা :

উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হতে হলে কোনো প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে সংবিধানে উল্লেখ আছে। প্রথমত, তিনি ভারতীয় নাগরিক হবেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর বয়স ক্ষমপক্ষে ৩৫ বছর হতে হবে। তৃতীয়ত, তিনি রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। চতুর্থত, প্রার্থী হওয়ার সময় তিনি কোনো সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

কার্যকালের মেয়াদ এবং পদচ্যুতির পদ্ধতি :

উপরাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ হল পাঁচ বছর। তিনি পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন। আবার নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার আগেও পদত্যাগ করতে পারেন অথবা পদচ্যুত হতে পারেন। রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্য যদি উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সেই প্রস্তাব যদি লোকসভার দ্বারা সমর্থিত হয় তবে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়। সাধারণত সংবিধানলঙ্ঘনের অভিযোগেই উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি হতে পারে। উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে হলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয়।

ক্ষমতা ও পদমর্যাদা :

উপরাষ্ট্রপতিরর কোনো বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা নেই। তবে কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তাছাড়া উপরাষ্ট্রপতি হলেন পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। মর্যাদার দিক থেকে উপরাষ্ট্রপতির পদটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাগত বিচারে রাষ্ট্রপতির পরেই হল উপরাষ্ট্রপতির স্থান।

০৬.১০ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা

গঠন : সংবিধানের ৭৪ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কাজে সাহায্য ও পরামর্শ (aid and advice) দেবার জন্যে একটি মন্ত্রীসভা থাকবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ

দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। লোকসভার অন্যান্য সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। মন্ত্রীরা পার্লামেন্টের যে কোনো একটি কক্ষের সদস্য হবেন। তবে পার্লামেন্টের সদস্য না হলেও কোনো ব্যক্তিকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা যায়। তবে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার ৬ মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের কোনো কক্ষের সদস্য নির্বাচিত হতে না পারলে সেই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়।

দায়িত্বশীলতা : মন্ত্রীসভা যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী। লোকসভা যদি কোনো একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে তবে সেটি সমগ্র মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা হিসাবে গণ্য হবে। এই অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।

সাধারণত মন্ত্রীসভায় (১) ক্যাবিনেট মন্ত্রী (২) রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং (৩) উপ-মন্ত্রী এই তিন শ্রেণির মন্ত্রীরা থাকেন। ক্যাবিনেটমন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সদস্য। সরকারি নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মত রাষ্ট্রমন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সদস্য নয়। তাঁরা কোনো ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনেও থাকতে পারেন অথবা স্বাধীনভাবে কোনো দপ্তরেরর দায়িত্বভার পালন করতে পারেন। উপমন্ত্রীরা বিভাগীয় মন্ত্রীদের দপ্তর পরিচালনায় সাহায্য করেন।

ক্যাবিনেট : বর্তমানে যে কোনো দেশের সরকারের পক্ষে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির আশু সমাধান জরুরী বলে বিবেচিত হয়। সাধারণত মন্ত্রীসভায় অনেক মন্ত্রী থাকেন। তাঁদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। এই কারণে মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি ক্ষুদ্র সংস্থা গঠন করেন। এই ক্ষুদ্র সংস্থাটিকেই ক্যাবিনেট বলা হয়। ক্যাবিনেটের কাজকর্মে সাহায্য করার জন্যে ক্যাবিনেটের একটি কর্মদপ্তর থাকে।

ভারত সরকারের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে।

প্রথমত, প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একটি অন্যতম দায়িত্ব। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব সংসদের হাতেই থাকা উচিত। তাত্ত্বিক দিক থেকে ভারতে সংসদই হল প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের কেন্দ্র। কিন্তু বাস্তবে এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার করায়ত্ত হয়েছে। সাধারণত সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সুতরাং মন্ত্রীসভা যে নীতি গ্রহণ করে সংসদে সেটি সহজেই অনুমোদিত হয়। আবার সরকারি নীতি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ক্যাবিনেটই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষানীতি প্রভৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীসভা আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। আইনপ্রণয়নের মূল ক্ষমতা তত্ত্বগতভাবে সংসদের হাতেই ন্যস্ত। কিন্তু সংসদের সদস্যসংখ্যা অনেক। সীমিত সময়ের মধ্যে সংসদের বহুসংখ্যক সদস্যদের পক্ষে প্রতিটি বিলের খুঁটিনাটি বিচার করা সম্ভব হয় না। বিলের মূল নীতি ও কাঠামোটি পার্লামেন্ট স্থির করে দেয়। বিলের বিস্তারিত নিয়মনীতি নির্ধারণের দায়িত্ব মন্ত্রীসভার উপর ন্যস্ত করা হয়।

এই অর্পিত ক্ষমতাই আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে মন্ত্রীসভার ক্ষমতাকে বিশেষ শক্তিশালী করেছে। এই অর্পিত ক্ষমতার ভিত্তিতে মন্ত্রীসভা যে সমস্ত বিধিবিধান প্রণয়ন করে সেগুলিকে অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন বলে।

তৃতীয়ত, মন্ত্রীসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল প্রশাসনিক দায়িত্বপালন। ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। শাসনের প্রকৃত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে মন্ত্রীসভার উপর। মন্ত্রীরাই প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালনা করেন। এ ব্যাপারে সরকারের স্থায়ী কর্মচারীরা মন্ত্রীদের সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে মন্ত্রীদের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চতুর্থত, সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও মন্ত্রীসভার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। করধার্য, ব্যয়বরাদ্দ প্রভৃতি বিষয়ে মূলনীতি মন্ত্রীসভাই নির্ধারণ করে। আবার প্রত্যেক আর্থিক বছরের সরকারের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের খসড়া হিসাব বা বাজেট প্রস্তুত করার দায়িত্ব থাকে অর্থমন্ত্রীর উপর। অর্থমন্ত্রীর খসড়াবাজেট ক্যাবিনেটের দ্বারা অনুমোদিত হলে সেটি পার্লামেন্টে পেশ করা হয়।

পঞ্চমত, শাসন বিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রেও মন্ত্রীসভার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

০৬.১১ প্রধানমন্ত্রী

ভারতীয় সংবিধানের ৭৮(১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্যাবলী সম্পাদনে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে। ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর নামে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও বাস্তবে তিনি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করেন। মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন শাসকপ্রধান।

সংবিধানের ৭৫ ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করবেন। সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্টপতির কোনো স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নেই। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু লোকসভায় যদি কোনো দলের একক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে তবে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির স্ব-বিবেচনা প্রয়োগের অবকাশ থাকে।

সংসদের সদস্য নন এমন ব্যক্তিও প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হতে পারেন। তবে নিয়োগের ছ'মাসের মধ্যে তাঁকে সংসদের যে কোনো কক্ষের সদস্য হতে হয়। নতুবা তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস হল দুটি; (১) সাংবিধানিক ধারা এবং (২) শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। রাষ্ট্রপতির নামে শাসন পরিচালিত হলেও

কার্যক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। মন্ত্রীসভার পরামর্শ বলতে বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শকেই বোঝায়। কারণ প্রধানমন্ত্রী হলেন মন্ত্রীসভার নেতা।

দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে প্রধান যোগসূত্র। সংবিধানের ৭৮ ধারা অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা ও আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রীসভার সকল সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য। আবার যদি রাষ্ট্রপতি নিজে প্রশাসন এবং আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে কোনো সংবাদ জানতে চান তবে তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করার দায়িত্ব হলো প্রধানমন্ত্রীর, রাষ্ট্রপতি কোনো মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সমগ্র মন্ত্রীসভার বিবেচনার জন্যে পেশ করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পারেন।

ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম এবং ৪৪তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। রাষ্ট্রপতির এই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীই হলেন প্রকৃত শাসকপ্রধান।

তৃতীয়ত, মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীই হলেন মন্ত্রীসভার মূল ভিত্তি। মন্ত্রীসভার গঠন, মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর প্রভৃতি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর সমূহ বণ্টিত হয়। কোনো মন্ত্রীকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাই কার্যকর হয়।

চতুর্থত, মন্ত্রীসভার সভাপতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মন্ত্রীসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এবং সভার কর্মসূচী নির্ধারণ করেন। মন্ত্রীরা বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব পালন করলেও প্রধানমন্ত্রী সকল দপ্তরের কার্যাবলী তদারক করেন। বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নীতিগত বিরোধের মীমাংসা করা প্রধামন্ত্রীর দায়িত্ব।

পঞ্চমত, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুসারেই লোকসভার অধিবেশনের সময়কাল এবং কর্মসূচী নির্ধারিত হয়ে থাকে। তিনি লোকসভার কার্যপরিচালনাসংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য। সংসদে প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের মুখপাত্র। সেই হিসাবে পার্লামেন্টে সরকারি নীতিসমূহ ব্যাখ্যার চূড়ান্ত দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। বিতর্কের সময় কোনো মন্ত্রী প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তাঁকে সাহায্য করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন।

ষষ্ঠত, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের উপরেই দলের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে নির্ভর করে। সরকার পরিচালনায় তাঁর যোগ্যতা এবং দলীয় কর্মসূচী রূপায়ণে তাঁর সাফল্যের উপরেই দলের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

সপ্তমত, জাতির নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতির নেতা হিসাবে তাঁর নেতৃত্বের সাফল্যের উপরেই তাঁর জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে নির্ভর করে। তাঁকে জনমতের গতি-প্রকৃতিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হয় এবং জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কার্যকর

ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সংকটপূর্ণ সময়ে সমগ্র জাতি প্রধানমন্ত্রীর নিকটেই সমাধানের প্রত্যাশা করে।

বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বেশ কয়েক বছর ভারতে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেছেন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মকুশলতার দরুন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কার্যত প্রধানমন্ত্রী-শাসিত শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। ক্যাবিনেটের পরামর্শের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব আস্থাভাজন ব্যক্তি ও পদস্থ আমলাদের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করেন। সরকারি নীতি নির্ধারণ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর একক সিদ্ধান্তই প্রাধান্য অর্জন করে। শ্রীমতী গান্ধীর পরে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলেও এই ধারা অব্যাহত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে একদলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব প্রধানমন্ত্রীকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে। ক্রমে সময় ও রাজনীতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় জোটবদ্ধ রাজনীতির উদ্ভব ঘটে ১৯৬৭ সালে। ৯০-এর দশকে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের উদ্ভবের ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে একদলীয় প্রাধান্যের অবসান ঘটে। বহুদলভিত্তিক রাজনীতির প্রতিফলন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাতেও দেখা যায়। এই পাঁচমেশালী মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন না। কারণ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রীসভার শরিক দলগুলির মতামতকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না। তবে প্রধানমন্ত্রী যদি উপযুক্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন তবে তিনি তাঁর মতামতকে বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং জাতির নেতা হিসাবে শাসনব্যবস্থায় এক শক্তিশালী ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেও তাঁর পক্ষে নিজেকে একনায়কে পরিণত করা কঠিন। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিভিন্ন বিষয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রথমত, জননায়ক হিসাবে তিনি জনসভাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, তাঁকে বিরোধী দল ও গণমাধ্যমগুলির সমালোচনা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। তৃতীয়ত, দলের শক্তিশালী নেতাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করলে দলে ভাঙন ধরার সম্ভাবনা থাকে। চতুর্থত, মন্ত্রীসভা গঠন, মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তরবণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁকে আঞ্চলিক, ভাষাগত, সম্প্রদায়গত প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিত্বের কথা বিবেচনা করতে হয়। সর্বোপরি, ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী। মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদ তথা সমগ্র জাতির নিকট দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্যবিরোধী কোনো কাজ করা কঠিন।

০৬.১২ সারাংশ

ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এই উদ্দেশ্যে একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়। পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের নির্বাচিত সদস্য এবং রাজ্যবিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা এই নির্বাচকমণ্ডলীতে থাকেন। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব যথাসম্ভব একই হারে হতে হবে। তাছাড়া ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ভোটের সমতা রক্ষা করতে হবে। রাষ্ট্রপতি একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে রাজ্যবিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। এর জন্যে প্রত্যেক রাজ্যের জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। এই ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটি হলো সেই রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের মোট ভোট সংখ্যা। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টের সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ধারণের জন্যে রাজ্যবিধানসভার সদস্যদের মোট ভোট সংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ব্যালটপত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী নামের তালিকা থাকে। ভোটদাতারা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীদের নামের পাশে, ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতির সংখ্যা বসাবেন। প্রথম পছন্দ না জানালে ব্যালটপত্র বাতিল হয়। এবার সকল প্রার্থীর প্রথম পছন্দের ভোট সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করে 'কোটা' নির্ধারণ করা হয়। কোনো প্রার্থী কোটা-সংখ্যক বা তার বেশি ভোট পেলে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হন। যদি কোনো প্রার্থীই কোটা সংখ্যক ভোট না পান তবে সবচেয়ে কম সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোটের প্রার্থীকে বাদ দিয়ে তাঁর ব্যালট পত্রের দ্বিতীয় পছন্দের ভোটগুলিকে অন্যান্য প্রার্থীদের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং কোনো প্রার্থী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এই হস্তান্তরপর্ব চলতে থাকে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতিটি খুবই জটিল। এতে দলীয় রাজনীতি বিশেষভাবে কাজ করে। কোনো বিধানসভা বাতিল থাকলেও রাষ্ট্রপতির নির্বাচন স্থগিত থাকে না। সমালোচকরা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের এই ত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। প্রকৃত শাসনক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রীসভার হাতে ন্যস্ত। সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেগুলি তিনি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করেন।

রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলির মধ্যে প্রথমে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা যায়।

রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে তাঁর নিয়োগসংক্রান্ত ক্ষমতা। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল ছাড়াও সরকারের বিশিষ্ট উচ্চপদাধিকারীগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংবিধান কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীকে অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করেছে। রাষ্ট্রপতির শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর সামরিক ক্ষমতা। তিনি ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর

সর্বাধিনায়ক। রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত হলো তাঁর পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ক্ষমতা। ভারত সরকারের কূটনীতিক কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়।

রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে দেখা হয়। তিনি সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি সংসদের যে কোনো কক্ষ বা উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন। সংসদের উচ্চ কক্ষে ১২ জন সদস্য তিনিই মনোনীত করতে পারেন। লোকসভায় দুজন ইঙ্গ-ভারতীয় প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিল আইনে পরিণত হবার জন্যে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে তিনি অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরী আইন জারী করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আয়ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব বা বাজেট সংসদে পেশ করা। সংসদে কোনো কর বা কর সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্যে বা অর্থবিল পেশ করার জন্যে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়।

রাষ্ট্রপতির বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে অন্যতম হল তাঁর ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন, যথা, জাতীয় আপৎকালীন, রাজ্যগুলির সংবিধানিক বিপর্যয় এবং আর্থিক সংকটজনিত জরুরী অবস্থা।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা দীর্ঘকাল যাবৎ একটি বিতর্কিত বিষয় ছিল। সংবিধানের ৪২তম এবং ৪৪তম সংশোধন পাশের পর তার অবসান ঘটেছে। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য।

তবে রাষ্ট্রপতি নিছক নামসর্বস্ব শাসক নয়। তিনি মন্ত্রীসভাকে উৎসাহিত ও সতর্ক করতে পারেন। লোকসভায় কোনো রাজনীতিক দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে রাষ্ট্রপতি নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন করতে পারেন। জাতির প্রতীক এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বিচক্ষণ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। প্রথমত, ৩৫২ ধারায় রাষ্ট্রপতির হাতে জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে। এই ঘোষণা পার্লামেন্টের দ্বারা এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত হওয়া দরকার। জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত, ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এই ঘোষণাটিও পার্লামেন্টের দুটি কক্ষে দুইমাসের মধ্যে অনুমোদিত হওয়া দরকার। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে সেই রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি নিজে গ্রহণ করতে পারেন অথবা রাজ্যপাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে এই দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারেন। এই সময় পার্লামেন্ট রাজ্যের জন্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে বা আইন করে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারে। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেবার বা স্থগিত রাখার জন্যে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারী করতে পারেন। ৩৬০ ধারা

অনুসারে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। পার্লামেন্টের দ্বারা অনুমোদিত হলে ঘোষণাটি অনির্দিষ্টকালের জন্যে বলবৎ থাকতে পারে। আর্থিক জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায়। তাছাড়া আর্থিক সমীচীনতার নীতি সম্পর্কে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে।

জরুরী অবস্থার সমালোচনায় বলা হয় যে এই ঘোষণার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয়। এই ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক এবং রাজ্যগুলির স্বার্থের পরিপন্থী। তবে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করা এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলী এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে। তাঁর কয়েকটি যোগ্যতার কথা সংবিধানে বলা আছে। আবার পাঁচ বছর শেষ হবার আগেই তিনি পদত্যাগ করতে পারেন বা পদচ্যুত হতে পারেন। তাঁর পদচ্যুতির প্রস্তাব রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত এবং লোকসভার দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্যে ১৪ দিনের নোটিশের প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে উপরাষ্ট্রপতি সেই দায়িত্ব পালন করেন। মর্যাদাগত বিচারে রাষ্ট্রপতির পরেই তাঁর স্থান। পদাধিকারবলে উপরাষ্ট্রপতি হলেন রাজ্যসভার সভাপতি।

ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনের প্রকৃত দায়িত্ব মন্ত্রীসভার উপর। মন্ত্রীসভা যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী। মন্ত্রীসভার মধ্যে থেকে কয়েকজনকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি ক্ষুদ্র সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থাটি ক্যাবিনেট নামে পরিচিত। সাধারণ মন্ত্রীসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী—এই তিনশ্রেণীর মন্ত্রীরা থাকেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার কার্যাবলীর মধ্যে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা, সরকারি আয়-ব্যয় নির্ধারণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই সাধারণত রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী একাধারে রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা এবং রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে প্রধান যোগসূত্র। আবার মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে মন্ত্রীসভার গঠন, মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন, কোনো মন্ত্রীকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেকখানি দলীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। একদলীয় মন্ত্রীসভায় তিনি যে ক্ষমতা ভোগ করেন, পাঁচমেশালী দলের মন্ত্রীসভায় তাঁর ততটা ক্ষমতা থাকে না, বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা জনমত, বিরোধীদল ও গণমাধ্যমগুলির সমালোচনা, দলের শক্তিশালী নেতাদের প্রভাব, মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নিজেকে একনায়কে পরিণত করা কঠিন। তবে বিচক্ষণ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় বিশেষ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

(গ) রচনামুখী প্রশ্ন :

১। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ব্যাখ্যা কর।

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। কোন সময় ভারতে শাসনব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়?

০৬.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Johari, J. C., India Govt and Poliitics

(২) Subhas Kashyap, Our Constitution.

(৩) Austin Granville, The Indian Constitution Cornerstone of a Nation.

(৪) Sikri — Indian Govt and Politics

(৫) দুর্গাদাস বসু — ভারতের সংবিধান পরিচয়।

(৬) নিমাই প্রামাণিক — ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা।

(৭) অনাদি কুমার মহাপাত্র — ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

(গ) রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ব্যাখ্যা কর।

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কোন সময় ভারতে শাসনব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়?

০৬.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Johari, J. C., India Govt and Poliitics

(২) Subhas Kashyap, Our Constitution.

(৩) Austin Granville, The Indian Constitution Cornerstone of a Nation.

(৪) Sikri — Indian Govt and Politics

(৫) দুর্গাদাস বসু — ভারতের সংবিধান পরিচয়।

(৬) নিমাই প্রামাণিক — ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা।

(৭) অনাদি কুমার মহাপাত্র — ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

একক ০৭ ❐ ভারতীয় ইউনিয়নের আইনবিভাগ

গঠন

০৭.১ উদ্দেশ্য

০৭.২ প্রস্তাবনা

০৭.৩ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় ভূমিকা

০৭.৪ ভারতীয় সংসদের গঠন

রাজ্যসভা

লোকসভা

লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সম্পর্ক

০৭.৫ সংসদ ও শাসনবিভাগ

০৭.৬ সংসদ ও বিচারবিভাগ

০৭.৭ সংসদ ও রাজ্য আইনসভা

০৭.৮ সংসদের কার্যাবলী

০৭.৯ লোকসভার স্পীকার

০৭.১০ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতি

অর্থবিল পাসের পদ্ধতি

সংবিধান সংশোধন বিল পাসের পদ্ধতি

০৭.১১ সংসদের ক্ষমতা হ্রাস

০৭.১২ সারাংশ

০৭.১৩ অনুশীলনী

০৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

০৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন ভারতীয় ইউনিয়নের আইনবিভাগ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়। যে বিষয়গুলি এই এককে আলোচিত হয়েছে তা হল—

- সংসদের গঠন ও কার্যাবলী; রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং উভয়ের সম্পর্ক।
- সংসদের সঙ্গে শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ ও রাজ্য আইনসভার সম্পর্ক।
- সংসদের আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি, কমিটি ব্যবস্থা ও সংসদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা এবং
- সংসদের শাসনতান্ত্রিক অবস্থান এবং বর্তমানে সংসদের মর্যাদাহ্রাসের কারণসমূহ

০৭.২ প্রস্তাবনা

ভারতীয় ইউনিয়নের আইনবিভাগের ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত। ভারতের সংসদ ভারতের জনগণের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিসভা এবং ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। সংসদ আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

ভারতীয় সংবিধান দ্বারা তৈরি ভারতের সংসদ রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভা নিয়ে গঠিত।

০৭.৩ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভাকে সংসদ বা পার্লামেন্ট বলা হয়। ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংসদ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আমরা এই পাঠসংকলনের শুরুতে দেখেছি যে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতবাসীকেই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলে মনে করা হয়েছে। জনগণের এই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে ভারতের সংসদের মাধ্যমে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংসদই হল চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক। সংসদই মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রয়োজন হলে তাকে অপসারণ করে। কারণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং যতদিন সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন পাবে ততদিন ক্ষমতায় থাকবে। তাই সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের দায়িত্বশীলতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

০৭.৪ ভারতীয় সংসদের গঠন

ভারতের সংসদ একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Bicameral Legislature)। উচ্চকক্ষ হল রাজ্যসভা আর নিম্নকক্ষ লোকসভা। সংসদ অনুসারে ভারতের সংসদ গঠিত হয় রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভা নিয়ে। ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর মত ভারতের রাষ্ট্রপতিও সংসদের একটি অংশ কারণ রাষ্ট্রপতিকে ছাড়া সংসদের আইন প্রণয়নের কাজ সম্পূর্ণ হয় না।

রাজ্যসভা

(ক) রাজ্যসভার গঠন ঃ

রাজ্যসভা সংসদের উচ্চকক্ষ। ভারতের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় বলেই এই সভাকে

রাজ্যসভা বলা হয়। সংবিধানের ৮০ নং ধারায় রাজ্যসভায় গঠন সম্পর্কে উল্লেখ আছে। অনাধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হবে। এরমধ্যে চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজসেবায় বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। সংসদের উচ্চকক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থান দেবার জন্যই সংবিধানে এই মনোনয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাকি ২৩৮ জন সদস্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি। রাজ্যসভার বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ২৪৫। রাজ্যের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। আর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সংসদের আইন নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচিত হন।

রাজ্যসভায় আসন বণ্টনের ভিত্তি হল জনসংখ্যা। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সুইজারল্যান্ডের মত সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হয় নি। যার ফলে উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যা যেখানে শুরু মণিপুর, মিজোরাম, সিকিম বা ত্রিপুরার মত ছোট ছোট রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা সেখানে মাত্র ১। আবার জনসংখ্যার অত্যল্পতার জন্য জাতীয় রাজধানী দিল্লী আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পণ্ডিচেরী ছাড়া আর কোনো অঞ্চলের প্রতিনিধি রাজ্যসভায় নেই।

(খ) সদস্যদের যোগ্যতা ঃ

রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে সংবিধানের ৮৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, কমপক্ষে ৩০ বছর বয়স্ক হতে হবে এবং সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা থাকতে হবে। যেমন, ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচন প্রার্থীকে সেই রাজ্যের কোন লোকসভা কেন্দ্রের ভোটদাতা হতে হবে।

(গ) রাজ্যসভার মেয়াদ ঃ

রাজ্যসভা স্থায়ী কক্ষ, একে ভেঙে দেওয়া যায় না, সদস্যগণ ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হলেও প্রতি ২ বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং ঐ সংখ্যক নতুন সদস্য নির্বাচিত হন।

(ঘ) রাজ্যসভার সভাপতি ঃ

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি যিনি সংসদের উভয় সভার দ্বারা নির্বাচিত হন পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। রাজ্যসভার সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচিত করেন যিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভার কাজ পরিচালনা করেন।

সভাপতি রাজ্যসভার সদস্য নন। এবং নির্ণায়ক ভোট ছাড়া তাঁর কোন ভোটাধিকারও নেই।

(ঙ) রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

প্রথমত, আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা লোকসভার মতই সমান ক্ষমতা ভোগ করে এবং উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কোন বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় না।

রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে কোন সাধারণ বিলের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আহূত উভয় সভার যুগ্ম অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে তার নিষ্পত্তি ঘটে। অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। রাজ্যসভা শুধু লোকসভা কর্তৃক উত্থাপিত ও অনুমোদিত অর্থবিল ১৪ দিনের মধ্যে অনুমোদন দেয়। ঐ সময়ের মধ্যে অনুমোদন না দিলেও ধরে নেওয়া হবে রাজ্যসভা অনুমোদন দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীসভার গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণের ব্যাপারে রাজ্যসভার প্রকৃত কোন ক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী লোকসভা—রাজ্যসভা নয়। কারণ, মন্ত্রীসভা কেবল লোকসভার কাছেই দায়িত্বশীল থাকে, রাজ্যসভার কাছে নয়। তবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এবং সরকারি কাজকর্মের আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে রাজ্যসভা শাসন বিভাগের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়ত, কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজ্যসভা লোকসভার সঙ্গে সমান ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন, উচ্চ পদাধিকারীদের ইম্‌পিচমেন্ট বা অপসারণ জরুরী অবস্থা ঘোষণার অনুমোদন, বিভিন্ন কমিশন ও পদাধিকারীর প্রতিবেদন বিবেচনা, কোন রাজ্যের নাম, সীমানা পরিবর্তন কিংবা বিধান পরিষদের সৃষ্টি বা বিলোপ, হাইকোর্টের এলাকা বৃদ্ধি, কোন নিয়োগকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কর্তৃক কমিশনের এক্তিয়ার বহির্ভূত করা ইত্যাদি।

পরিশেষে উল্লেখ করা দরকার যে মুখ্যত দুটি ক্ষেত্রে সংবিধান রাজ্যসভাকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছেন (১) সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা অনুসারে রাজ্যসভা যদি উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়ন করা দরকার তাহলে সংসদ সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

(২) সংবিধানের ২১২ নং ধারা অনুসারে রাজ্য সভা যদি উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে এরকম প্রস্তাব পাশ করে যে জাতীয় স্বার্থে সংসদের আরও সর্বভারতীয় কৃত্যক (All India Services) সৃষ্টি করা উচিত তাহলে সংসদ আরও সর্ব-ভারতীয় কৃত্যক গঠনের ব্যবস্থা করতে পারে।

(চ) রাজ্যসভার মূল্যায়ন ঃ

রাজ্যসভা সংসদের শুধু যে পুনর্বিবেচনাকারী বা সংশোধনকারী কক্ষ তাই নয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গ রাজ্যগুলির স্বার্থসংরক্ষণকারী কক্ষও বটে। রাজ্যসভার এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ভূমিকাটি সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা থেকে বোঝা যায়।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যসভা যদি রাজ্যগুলির সভা হয়ে থাকে তাহলে এর সকল সদস্যই রাজ্যের প্রতিনিধি হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে এর কিছু সদস্য কেন রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হবেন? এই মনোনীত সদস্যরা নিশ্চয়ই রাজ্যের প্রতিনিধি নন, কেন্দ্রের প্রতিনিধি। রাজ্যসভার এই ১২ জন সদস্য মনোনয়ন করার ব্যবস্থার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে গুণীজনের উপস্থিতিতে আইনসভার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মনোনয়ন কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লাগানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

তৃতীয়ত, সংবিধানপ্রনেতাগণ আশা করেছিলেন যে রাজ্যসভা প্রধান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মর্যাদাপূর্ণ বিতর্কস্থল হবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হয় নি। যদিও অতীতে অনেক গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি রাজ্যসভার সদস্যপদ অলংকৃত করেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা অনেক সময়েই দলীয় রাজনীতি এবং সদস্যদের উচ্ছৃঙ্খল ও অভদ্র আচরণ রাজ্যসভার মান-মর্যাদা খর্ব করেছে।

চতুর্থত, ফরাসী রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী আবেসিয়ে বলেছিলেন, "দ্বিতীয়কক্ষ যদি প্রথমকক্ষের সঙ্গে একমদত হয় তাহলে তা অনাবশ্যক; আর যদি ভিন্নমত পোষণ করে তবে তা ক্ষতিকারক"। খুবই সত্যি কথা।

লোকসভা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত, সুতরাং লোকসভা জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু রাজ্যসভায় তা হয় না। তাছাড়া রাজ্যসভা লোকসভার তুলনায় সংখ্যালঘিষ্ঠও বটে। এমতাবস্থায় লোকসভার কোন সিদ্ধান্ত যদি রাজ্যসভার দ্বারা নাকচ হয়ে যায় তাহলে তা নিঃসন্দেহে অগণতান্ত্রিক হবে, কারণ সেক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছাকেই বাধাদান করা হবে। এটা সংবিধানপ্রণেতাদের অভিপ্রায়ও ছিল না।

এই সমস্ত কারণে অনেকে রাজ্যসভার বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী। তবে সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। রাজ্যসভার প্রকৃত ভূমিকা সংশোধনকারী কক্ষ। রাজ্যসভার নিজেকে ত্রুটি সংশোধনকারী কক্ষ হিসাবেই দেখা উচিত। রাজ্যসভার কাজ হবে লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলের উন্নতিসাধন, সে বিলে বাধা দান নয়। যা দরকার তা হল উভয় সভার সহযোগিতা, কারণ কোন কক্ষই এককভাবে সংসদ হতে পারে না। দুটি কক্ষ নিয়েই সংসদ।

লোকসভা

লোকসভা সংসদের নিম্নকক্ষ, যদিও এই কক্ষেই জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপকতম সমাবেশ। এই কক্ষের সদস্যগণ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। বর্তমানে অন্তত ১৮ বছর বয়স্ক যে কোন ভারতীয় নাগরিক লোকসভার নির্বাচনে ভোট দিতে পারে।

(ক) গঠন ঃ

লোকসভা গঠিত হয় বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচিত অনধিক ৫৩০ জন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত অনধিক ২০ জন সদস্য নিয়ে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতি ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে ২ জন সদস্য মনোনীত করতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন যে ঐ সম্প্রদায় থেকে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য লোকসভায় নির্বাচিত হননি। সুতরাং সংবিধান অনুসারে লোকসভার বর্তমান সদস্যসংখ্যা সর্বাধিক ৫৫২ জন হতে পারে। তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য লোকসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

(খ) সদস্যপদের যোগ্যতা ঃ

লোকসভার সদস্যপদ প্রার্থীকে (১) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে (২) অন্তত ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। এবং (৩) সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ১৯৮৫ সালের ৫২ তম সংবিধান

সংশোধন অনুসারে রচিত ১৯৯১ সালের দলত্যাগবিরোধী আইন লোকসভার সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত অযোগ্যতা সম্পর্কিত কিছু নিয়মের উল্লেখ করেছে। এই নিয়ম ভঙ্গ করা হলে সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়।

(গ) কার্যকালের মেয়াদ ঃ

সাধারণ অবস্থায় লোকসভার মেয়াদ ৫ বছর। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন ডাকতে পারেন। আবার জরুরী অবস্থা জারী হলে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ প্রতিবার ১ বছর করে সংসদ বাড়াতে পারে।

(ঘ) অধিবেশন ঃ

রাষ্ট্রপতি লোকসভার অধিবেশন আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে কিংবা ভেঙে দিতে পারেন। সংবিধান অনুসারে দুটি অধিবেশনের মধ্যে ৬ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হবে না। রাষ্ট্রপতি লোকসভার প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন। কিংবা যে কোন সময় লোকসভায় বাণী পাঠাতে পারেন।

(ঙ) লোকসভার স্পীকার ঃ

লোকসভার সভাপতিত্ব করেন স্পীকার। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার সভার কাজ পরিচালনা করেন। উভয়েই লোকসভার সদস্যগণ দ্বারা নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন।

(চ) লোকসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে লোকসভাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মঞ্চ। যেহেতু তুলনায় রাজ্যসভার ক্ষমতা খুবই সীমিত তাই সংসদের ক্ষমতা বলতে লোকসভার ক্ষমতাই বোঝায়। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এই কক্ষই সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়ন, আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রণ জাতীয় প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং লোকসভার এই বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

আইন প্রণয়ন করাই হল লোকসভার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সংসদ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম তা সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত। সংবিধানের সপ্তম তপশিলে বর্ণিত কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের। যদিও যুগ্ম তালিকা সম্পর্কে রাজ্য বিধানসভা আইন প্রণয়নের অধিকারী, রাজ্যের আইনের সঙ্গে কেন্দ্রের আইনের বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রের আইন বলবৎ থাকে। আর রাজ্য তালিকা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য বিধান সভার হলেও কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কেও সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। এই বিশেষ অবস্থাগুলি হল ঃ (ক) জাতীয় স্বার্থে রাজ্যসভা অনুমতি দিলে, (খ) দুই বা ততোধিক রাজ্য নিজেদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনের জন্য অনুরোধ করলে; (গ) কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে (ঘ) জাতীয় জরুরী অবস্থা জারী হলে এবং (ঙ) কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন (৩৫৬ নং ধারা) জারি হলে সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে।

আমরা এর আগে দেখেছি যে সংসদের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অর্থবিল ছাড়া সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী এবং উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হলে তবেই একটি বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং তারপর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলে সেটি আইনে পরিণত হয়। সাধারণ বিল নিয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতির ডাকা উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে তার নিষ্পত্তি ঘটে। কিন্তু অর্থ বিলের ক্ষেত্রে লোকসভাই সর্বেসর্বা। অর্থ বিল একমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপিত হয় এবং লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। রাজ্যসভাকে তা ১৪ দিনের মধ্যে তা অনুমোদন করতে হয়। রাজ্যসভা অবশ্য ঐ বিল সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করতে পারে, কিন্তু সে সুপারিশ লোকসভা কর্তৃক সমর্থিত হতে হয়। কোন বিল অর্থ বিল কি না তাও স্থির করে লোকসভার স্পীকার, সুতরাং অর্থসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লোকসভাই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

(২) সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকার গঠনের একমাত্র ভূমিকা লোকসভার, কারণ কোন্ দল বা জোট মন্ত্রীসভা বা সরকার গঠন করবে তা নির্ভর করে লোকসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের উপর। রাষ্ট্রপতি লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নেতাকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। অনেক সময় মন্ত্রীসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ করতে বলতে পারেন। যেমন, ১৯৯৯ সালে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে জোট সরকার থেকে আন্না ডি এম কে-র সমর্থন তুলে নিলে মন্ত্রীসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। রাষ্ট্রপতি তখন প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভার আস্থা ভোট নিতে বলেছিলেন। মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে আস্থা ভোটের প্রস্তাব পরাজিত হলে বাজপেয়ী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টা চলে।

সরকার গঠন ছাড়াও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেও লোকসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মূল কথা হল আইনসভার কাছে সরকারের দায়িত্বশীলতা। আমরা আগেই দেখেছি যে এই দায়িত্বশীলতা একমাত্র লোকসভার কাছেই। সংবিধানের ৭৫(৩) নং ধারায় পরিষ্কার বলা আছে "মন্ত্রীসভা যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকবে"। এর অর্থ হল সরকারি নীতি ও কাজকর্ম পরিচালনার জন্য মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। সুতরাং সরকার গঠন করার পর সেই সরকারকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করা লোকসভার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন উপায়ে লোকসভা এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, যেমন—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মুলতুবী প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, অনাস্থা ইত্যাদি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই অনাস্থা প্রস্তাব। লোকসভা এই প্রস্তাব পাস করলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আবার, লোকসভায় কোন মন্ত্রীর পরাজয়কে সমগ্র মন্ত্রীসভার পরাজয়রূপে গণ্য করা হয়। সুতরাং মন্ত্রীসভা বা সরকার কতদিন ক্ষমতায় থাকবে তা নির্ভর করে লোকসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর। অনাস্থা প্রস্তাব পাস হওয়ার পর মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলে বিকল্প সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চলতে পারে, অথবা পরাজিত প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙে দিয়ে

নতুন নির্বাচন ডাকার জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে লোকসভায় আস্থা ভোটে হেরে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোন জোট কিংবা তৃতীয় কোন ফ্রন্ট বিকল্প সরকার গঠনে ব্যর্থ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি দ্বাদশ লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন ডেকেছিলেন।

অনাস্থা প্রস্তাব পাস কিংবা আস্থা ভোটে হেরে যাওয়া ছাড়াও কোন সরকারি বিল, বিশেষ করে বাজেট যদি লোকসভা প্রত্যাখ্যান করে তাহলেও তা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে লোকসভার অনাস্থা বোঝাবে, সুতরাং সেক্ষেত্রেও মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

(৩) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

লোকসভা জাতীয় অর্থের জিম্মাদার। সরকারের যাবতীয় আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লোকসভার একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। লোকসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার কোন কর ধার্য কিংবা ব্যয় নির্বাহ করতে পারে না। সরকারি আয়-ব্যয় সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত পথে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তদারকি করার জন্য লোকসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি আছে। এই দুটি কমিটি হল ঃ (ক) সরকারি হিসাব পরীক্ষা কমিটি (Public Accounts Committee), এবং (খ) আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি (Estimates Committee)। প্রতি বছর লোকসভায় আগামী বছরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট সংসদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়।

(৪) নির্বাচনমূলক ক্ষমতা ঃ

লোকসভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপতিও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন। নির্বাচনমূলক ক্ষমতা ছাড়াও লোকসভার হাতে গুরুত্বপূর্ণ অপসারণমূলক ক্ষমতাও আছে। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, লোকসভার স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি, মুখ্য নির্বাচনী অফিসার, রাষ্ট্রকৃত্যকের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অপসারণে লোকসভার অনুমোদন প্রয়োজন।

(৫) সাংবিধানিক ক্ষমতা ঃ

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে লোকসভার তথা সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ ব্যাপারে লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট কিংবা কেন্দ্ররাজ্য ক্ষমতা বণ্টনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংশোধনের ক্ষেত্রে লোকসভা রাজ্যসভা ছাড়াও রাজ্য বিধানসভাগুলির অন্তত অর্ধেকের সম্মতি দরকার হয়।

(৬) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থার ঘোষণা লোকসভা ও রাজ্যসভা কর্তৃক সমর্থিত হতে হয়, না হলে তা বাতিল হয়ে যায়। তাছাড়া জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সংবিধানের ৪৪-তম সংশোধন (১৯৭৮) লোকসভার হাতে এক বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে। লোকসভার এক-দশমাংশ সদস্য জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের ইচ্ছা

লিখিতভাবে জানালে লোকসভার স্পীকার অথবা রাষ্ট্রপতি ১৪ দিনের মধ্যে ঐ উদ্দেশ্যে লোকসভার এক বিশেষ অধিবেশন ডাকবেন।

এই সমস্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী ছাড়াও লোকসভাকে আরও কিছু ভূমিকা পালন করতে হয়। যেমন — বিভিন্ন কমিশন ও সাংবিধানিক পদাধিকারীর রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা,অধিকার ভঙ্গের জন্য কোন সদস্য বা বাইরের কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া, তথ্য সরবরাহ করা, জনমত গঠন করা ইত্যাদি।

লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সম্পর্ক

আমরা এর আগে দেখেছি যে ভারতীয় সংসদ একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। এর উচ্চ-কক্ষ, রাজ্যসভা আর নিম্ন-কক্ষ লোকসভা। এই দুটি কক্ষের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। তখন আমরা এ দুটি কক্ষের মধ্যে কি সাংবিধানিক সম্পর্ক তা তুলনামূলক আলোচনা করে দেখবো।

উভয় কক্ষের মধ্যে কিছু গঠন, যোগ্যতা ও কার্যকাল সংক্রান্ত পার্থক্য আছে। রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভার সদস্যসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা যেখানে ২৫০-এর বেশি হতে পারে না। সেখানে লোকসভার সদস্যসংখ্যা অনধিক ৫৫২। রাজ্যসভার সদস্যরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি, আর লোকসভার সদস্যরা ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি। রাজ্যসভার সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নিজ নিজ রাজ্যের বিধানসভার দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে লোকসভার সদস্যগণ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষে কিছু সদস্য মনোনীত করতে পারেন। তিনি রাজ্যসভায় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১২ জনকে মনোনীত করতে পারেন কিন্তু লোকসভায় ২ জন ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে মনোনীত করতে পারেন। রাজ্যসভার সদস্যপ্রার্থীকে কমপক্ষে ৩০ বছর হতে হয়। কিন্তু লোকসভার ক্ষেত্রে ২৫ বছর বয়স্ক হলেই চলে। আবার রাজ্যসভার প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কোন লোকসভার নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটার হতে হবে, কিন্তু লোকসভার প্রার্থীকে ভারতের যে কোন নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটার হলেই হয়।

রাজ্যসভা স্থায়ী কক্ষ। একে ভেঙে দেওয়া যায় না। এর সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। তবে ২ বছর অন্তর একতৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু লোকসভা স্থায়ী কক্ষ নয়। লোকসভার মেয়াদ ৫ বছর। এই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি একে ভেঙে দিতে পারেন; আবার জরুরী অবস্থায় এর মেয়াদ এক বছর করে বাড়ানো যায়।

এবারে আমরা ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করবো।

একমাত্র অর্থ বিল ও মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয়ে সংসদের দুটি কক্ষই সমক্ষমতাসম্পন্ন। ঐ দুটি বিষয় লোকসভার নিজস্ব বিষয়, সুতরাং এ ব্যাপারে রাজ্যসভার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন—

(১) অর্থবিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না।

(২) অর্থ বিল রাজ্যসভা প্রত্যাখ্যান কিংবা সংশোধন করতে পারে না—শুধু নিজস্ব মতামত বা সুপারিশ জানাতে পারে। যদি ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা অর্থ বিল পাশ না করে তাহলে তা পাশ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(৩) কোন বিল অর্থ বিল কিনা তা স্থির করবেন লোকসভার স্পীকার।

(৪) রাজ্যসভা 'বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি' বা বাজেট আলোচনা করতে পারে, কিন্তু দাবি মঞ্জুর করতে পারে না।

(৫) মন্ত্রীসভা লোকসভার কাছেই দায়ী থাকে, রাজ্যসভার কাছে নয়। সুতরং রাজ্যসভা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করতে পারে না। এবং সব শেষে

(৬) রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থার ঘোষণা প্রত্যাহারের জন্য লোকসভার এক-দশমাংশ সদস্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। সংবিধানের ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) লোকসভাকেই এই ক্ষমতা দিয়েছে, রাজ্যসভাকে নয়।

লোকসভার এই প্রাধান্যের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না যে রাজ্যসভা লোকসভার তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ। অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিল সম্পর্কে উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমতুল্য। উভয়ের অনুমোদন না থাকলে কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী। যেমন—রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও পদচ্যুতি। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রপতির জারি করা অর্ডিন্যান্স, জরুরী অবস্থার ঘোষণা — এ সবই সংসদের উভয় কক্ষেই পেশ করতে হয় এবং উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। অর্থ বিল এবং সংবিধান সংশোধনী বিল বাদে বাকি সমস্ত বিলের ক্ষেত্রে উভয় সভার মতবিরোধ উভয় সভার যুগ্ম অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে মিটে যায়। এই যুগ্ম অধিবেশনে লোকসভার স্পীকার সভাপতিত্ব করেন।

এ ছাড়া সংবিধান রাজ্যসভাকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে যা লোকসভাকে দেয় নি। সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা অনুসারে রাজ্যসভা যদি উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তাহলে সেই বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। আবার অনুরূপ সংখ্যারিষ্ঠতায় গৃহীত রাজ্যসভার প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংসদ অতিরিক্ত সর্বভারতীয় কৃত্যক (All India Service) গঠন করতে পারে।

৫৭.৫ সংসদ ও শাসন বিভাগ

সংবিধান অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের প্রধান। সমস্ত শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। তিনি এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে নিজে অথবা তার অধস্তন অফিসারদের মাধ্যমে সংবিধান অনুসারে

প্রয়োগ করবেন। সুতরাং সমস্ত শাসন বিভাগীয় কার্যাবলী রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। তবে সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভার সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে কাজ পরিচালনা করতে হয়। (৭৪ নং ধারা)। সুতরাং রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করে মন্ত্রীসভা।

যদিও রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্য বা সরকারি কর্মচারীরাও শাসনবিভাগের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বর্তমান আলোচনায় শাসন বিভাগ বলতে শুধু মন্ত্রীসভা বা রাজনৈতিক শাসন বিভাগকে বোঝানো হবে। ভারত সরকার এই মন্ত্রীদের নিয়েই গঠিত এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান।

নতুন লোকসভা গঠনের পর রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠন করার জন্য আহ্বান জানান। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের কোন সুযোগ নেই। তবে কদাচিৎ যদি লোকসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন অর্জনকারী নেতার অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা দেখা দেয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে একজনকে প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে পারেন যিনি তাঁর মতে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে সরকারের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম।

প্রধানমন্ত্রী সাধারণত লোকসভারই সদস্য যদিও রাজ্যসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের নজিরও আছে (ইন্দিরা গান্ধী, ১৯৬৬, পি. ভি. নরসিমা রাও, ১৯৯১); এমন কি সংসদের কোন কক্ষেরই সদস্য নন এমন ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছেন (দেব গৌড়া)। অন্যান্য মন্ত্রীগণ সংসদের যে কোন কক্ষের সদস্য হতে পারেন। সংসদের সদস্য নন এমন কাউকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করলে ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে যে কোন কক্ষের সদস্য হতে হয়। তা না হলে ইস্তফা দিতে হয়। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। মন্ত্রীসভা যৌথভাবে এবং একজন মন্ত্রী তাঁর দপ্তরের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারেই মন্ত্রীরা লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। সংবিধানেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশও আছে [৭৫(৩) নং ধারা]। এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়পূর্ণ মিশ্রণ থাকে, কারণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন এক দলীয় সদস্যদের হাতে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা থাকে যাঁরা আইনসভার নিম্নকক্ষে সংখ্যাধিক্য ভোগ করেন এবং ততক্ষণই তাঁরা ক্ষমতাশীল থাকেন যতক্ষণ তাঁদের সেই সংখ্যাধিক্য বজায় থাকে। সুতরাং ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় লোকসভার আস্থা বা সংখ্যাধিক্যের সমর্থন হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

ভারতের শাসন ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনসভার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাসনবিভাগ সংসদের বাইরের কোন সংস্থা নয়। এর অবস্থান সংসদের ভেতরেই। বলা যেতে পারে মন্ত্রীসভা হল সংসদের একটি কমিটি যার উপর শাসনপরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু মন্ত্রীসভার সদস্যরা সবাই সংসদের সদস্য এবং সংসদের কাছে দায়িত্বশীল থাকে, তাই উভয়ের সম্পর্ক কিছুটা পূর্ণ ও অংশের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয়। পরস্পরনির্ভরশীল এই দুই বিভাগের কার্যাবলীর প্রকৃতি অবশ্য ভিন্ন। সংসদের কাজ হল আইন

প্রণয়ন করা, শাসন বিভাগকে পরামর্শ দেওয়া, সমালোচনা করা এবং জনগণের অভাব অভিযোগ তুলে ধরা। শাসনবিভাগের কাজ হল শাসন করা; তবে আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও শাসন বিভাগকেই উদ্যোগ নিতে হয়। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব বা বিল এবং কাজের উত্থাপন করে মন্ত্রীসভা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সে বিল সহজেই পাশ হয়ে যায়। সুতরাং আইনগত দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে সংসদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, সংসদ সরকারের প্রভু। মন্ত্রীসভা গঠন থেকে শুরু করে তার কার্যকালের মেয়াদ সব কিছুই নির্ভরশীল সংসদের সমর্থনের উপর, বিশেষ করে লোকসভার আস্থার উপর। তবে, সংসদের এই নিয়ন্ত্রণ যতটা তাত্ত্বিক ততটা বাস্তব নয়। বাস্তবে মন্ত্রীসভাই সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে কারণ সংসদের অধিকাংশ সদস্য এবং মন্ত্রীসভা একই রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীভুক্ত। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রীসভা যে কোন ধরনের প্রস্তাব সংসদে পাশ করিয়ে নিতে পারে।

০৭.৬ সংসদ ও বিচারবিভাগ

আইন বিভাগ ও শাসনবিভাগের মত বিচারবিভাগও আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। বিরোধের ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসা এবং নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দ্বিভাগবিশিষ্ট বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। আমাদের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির জন্য একটি মাত্র অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই গোটা ব্যবস্থার শীর্ষে আছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নিচে আছে বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং হাইকোর্টের নিচে আছে অন্যান্য অধস্তন আদালত।

ভারতের আদালত সমূহের স্থাপন গঠন, এক্তিয়ার ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সংসদের আছে। বর্তমানে একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক ২৫ জন অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা বলে সংসদ বার বার আইন প্রণয়ন করে বিচারপতিদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। প্রতিটি রাজ্যেই একটি করে হাইকোর্ট আছে তবে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি সাধারণ হাইকোর্ট স্থাপন করার ক্ষমতা সংসদের আছে। হাইকোর্ট গঠিত হবে একজন প্রধান বিচারপতি এবং কতিপয় অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে যাঁরা সবাই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত। সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী মন্ত্রীসভা ছাড়াও প্রধানত বিচারকবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়; কারণ তাঁরাই এ বিষয়ে মতামত দেবার পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য।

সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের একজন বিচারক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু সংবিধান নির্দেশিত 'ইমপিচমেন্ট' পদ্ধতি ছাড়া তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা যায়। এবং এই ইমপিচমেন্টের ক্ষমতা একমাত্র সংসদের। এই পদ্ধতি অনুসারে অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের অভিযোগ সম্বলিত কোন প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্যের অধিকাংশ ও উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে পদচ্যুত করেন। এ পর্যন্ত দুর্নীতিমূলক আচরণের জন্য

ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব মাত্র একবারই সংসদে উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯৯৩ সালের মে মাসে সংসদ কর্তৃক সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ভি. রামস্বামীর বিরুদ্ধে আনীত এই ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে বাতিল হয়ে যায়। একমাত্র ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের উপর ছাড়া সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের বা হাইকোর্টের কোন বিচারকের আচরণ নিয়ে সংসদে আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা স্পষ্টতই শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।

সংসদ আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্রের জন্য এবং আলাদাভাবে রাজ্যের জন্য প্রশাসনিক আদালত গঠন করতে পারে এবং তাঁদের এলাকা ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। তাছাড়া সংবিধান অনুসারে সংসদ সর্বভারতীয় বিচারবিভাগীয় কৃত্যক গঠন করতে পারে। সংসদের কোন কক্ষের কার্যাবলী সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। সংসদের চার দেয়ালের মধ্যে যাই বলা হোক বা করা হোক তা নিয়ে আদালতে কোনরকম অনুসন্ধান করা যাবে না। সংসদের আভ্যন্তরীণ বিষয় বা কার্যপ্রণালী সম্পর্কে কোন আদালত কোন রিট বা আদেশ, নির্দেশ জারি করতে পারে না।

সংসদের সঙ্গে বিচার বিভাগের সম্পর্কের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা এই সঙ্গে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার আলোচনা না করি। আমরা জানি বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাবলে বিচারবিভাগ সংবিধানভঙ্গের অভিযোগে যে কোন আইন ও সরকারি সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিতে পারে। ভারতের সংবিধান জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দান করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে ক্ষমতা ও কার্যাবলীর এক্তিয়ার নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসদ যদি এমন আইন প্রণয়ন করে যা সংবিধানবিরোধী তাহলে সেই আইনকে আদালত বাতিল করে দেবে। সংবিধানের ১৩ নং ধারা পরিষ্কারভাবে সংসদ, রাজ্য আইনসভা কিংবা যে কোন কর্তৃপক্ষকে সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে আইন করতে নিষেধ করে দিয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে আইন করতে নিষেধ করে দিয়েছে। সংবিধানের ৩২ এবং ২২৬ নং ধারা যথাক্রমে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টকে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ক্ষমতা দিয়েছে। সুতরাং আদালতে সংসদের যেকোন আইনের সংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে কতকগুলি কারণে, যথা—(ক) আইনটি সংসদের আইন প্রণয়নের এক্তিয়ারের বাইরে; (খ) আইনটি সংবিধানের ব্যবস্থার বিরোধী; কিংবা (গ) আইনটি মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে।

সুপ্রিমকোর্ট দেশের সর্বোচ্চ বা শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট নিজে তার কোন সিদ্ধান্ত, ব্যাখ্যা বা রায় না পাল্টালে তা অবিসংবাদিত বিধান হিসাবে গণ্য করা হয় এবং দেশের সমস্ত আদালত তা মেনে নিতে বাধ্য থাকে। বিচার বিভাগ যখন সংসদের কোন আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে তখন সংসদ সেই আইনের ত্রুটি দূর করে পুনরায় সেই আইন পাস করতে পারে। অথবা তার সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে পারে যাতে ঐ একই আইন এখন বৈধ হতে পারে।

সুতরাং ভারতের সংসদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন আইনই বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার আওতায় পড়ে না। আবার ভারতে বিচার বিভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের মত ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার উপর কার্যত কোন সীমা নেই।

০৭.৭ সংসদ ও রাজ্য আইন সভা

ভারতের শাসন ব্যবস্থার কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় বলে এখানে দু ধরনের সরকারের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। একদিকে আছে কেন্দ্রীয় সরকার, অন্য দিকে রাজ্য সরকার। ভারতের সংবিধান উভয় সরকারের মধ্যে আইন, শাসন ও আর্থিক ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে বন্টন করে দিয়েছে। রাজ্য আইনসভাগুলি যাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে সেজন্য আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনটি তালিকার কথা সংবিধানের সপ্তম তপসিলে (Seventh Schedule) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিতে কেবলমাত্র সংসদই আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভা উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে।

সংসদ ও রাজ্য বিধানসভা নিজ নিজ এলাকায় স্বাতন্ত্র্য ভোগ করলেও ক্ষমতা বণ্টনের যে নীতি অনুসৃত হয়েছে তাতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই সংসদের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। তিনটি তালিকার মধ্যে কেন্দ্রীয় তালিকাই দীর্ঘতম এবং এই তালিকায় প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, রেলপথ, যোগাযোগ, ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাব্যবস্থার মত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত। তালিকা বহির্ভূত অবশিষ্ট ক্ষমতা সংসদের হাতে দেওয়া হয়েছে। আবার, যুগ্মতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইনের সঙ্গে রাজ্যের আইনের বিরোধ দেখা দিলে সংসদের আইনই বলবৎ থাকবে। সংবিধানের ২৫৬ নং ধারায় বলা হয়েছে প্রতিটি রাজ্যের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে পরিচালিত হবে। এমন কি যে বিষয়গুলি একমাত্র রাজ্যের জন্য সংরক্ষিত সে বিষয়গুলি সম্পর্কেও সংসদ কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় আইন প্রণয়ন করতে পারে। যেমন, রাজ্যসভা যদি বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই মর্মে প্রস্তাব পাস করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়ন করা উচিত তাহলে সংসদ রাজ্য-তালিকাভুক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিংবা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে সংসদ রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়েও আইন প্রণয়ন করতে পারে। আবার কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর করতে গিয়ে যদি রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের দরকার হয় তাহলেও তা সংসদই করবে। দুই বা ততোধিক রাজ্যের অনুরোধেও সংসদ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

কোন রাজ্যের আইন সভার দ্বিতীয় কক্ষের সৃষ্টি বা বিলোপ সাধন, নতুন রাজ্যের গঠন কিংবা কোন রাজ্যের নাম, সীমানার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে একমাত্র সংসদই সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও সংসদ একক ক্ষমতার অধিকারী, যদিও সামান্য কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার অনুমোদনসংক্রান্ত কিছুটা ভূমিকা আছে।

সুতরাং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংসদ ও রাজ্য আইনসভার নিজ নিজ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাতন্ত্র ভোগ করতে পারে সেজন্য সংবিধানে ক্ষমতাবিভাজন করে দেওয়া হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংসদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাজ্য, আইনসভার স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণেই ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন।

০৭.৮ সংসদের কার্যাবলী

সংসদ আজ শুধু আইন প্রণয়নকারী সংস্থাই নয়। আইন প্রণয়ন ছাড়াও সংসদকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বহু ধরনের কাজ করতে হয়। তাই সংসদকে বিবিধ-কর্মবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হয়। বিখ্যাত সংসদ বিশেষজ্ঞ ডঃ সুভাষ কাশ্যপ সংসদের কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা, প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করা, তথ্য সরবরাহ করা, প্রতিনিধিত্বমূলক, শিক্ষামূলক ও পরামর্শদান সংক্রান্ত কাজ করা, দ্বন্দ্বের নিরসন করা, আইন প্রণয়ন করা ও সরকারি সিদ্ধান্তকে বৈধতা প্রদান করা, সংবিধান সংশোধন করা, এবং নেতৃত্বের অনুশীলন ও যোগান দেওয়া। এই কাজগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

(১) প্রধানত মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বের নীতি কার্যকর করা ও বাজেট পাসের মধ্য দিয়ে সংসদ শাসন-বিভাগের উপর তার নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখে। আমরা জানি আমাদের এই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভা সমস্ত সরকারি নীতি ও কাজ পরিচালনার জন্য সংসদের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। বাস্তবে এই দায়িত্বশীলতার অর্থ হল মন্ত্রীসভাকে সর্বদা লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে চলতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সুতরাং সংসদ অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করতে পারে।

অনুরূপভাবে বাৎসরিক ব্যয়-মঞ্জুরীর দাবি ও করধার্যের প্রস্তাব বাজেট সংসদে উত্থাপন করে সরকার। কিন্তু বাজেট সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। সুতরাং কর ধার্যের প্রস্তাব এবং ব্যয়-মঞ্জুরীর দাবি অনুমোদন, সংশোধন বা প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে সংসদ বিশেষ করে লোকসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। কারণ সংসদের অনুমোদন ছাড়া সরকার একটি পয়সাও করধার্য করতে পারে না, কিংবা ব্যয় করতে পারে না।

এইভাবে সংসদ শাসন বিভাগের উপর তার রাজনৈতিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। (২) সংসদ প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে পরোক্ষভাবে মন্ত্রীদের মাধ্যমে। মন্ত্রীরা সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা কার্যকর করে প্রশাসন বা রাষ্ট্রীয় কৃত্যকের সদস্যগণ। কিন্তু একজন মন্ত্রী তার দপ্তরের সমস্ত কাজকর্ম ও ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য নিজে দায়ী থাকেন। তাই কোন বিভাগের অফিসার বা কর্মচারীর ত্রুটিবিচ্যুতি বা দুষ্কর্মের জন্য ঐ বিভাগীয় মন্ত্রী সংসদের কাছে দায়ী থাকেন। বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ প্রশাসনের উপর নজর রাখে। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গঠন, প্রশ্নজিজ্ঞাসা, দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশ, আলোচনা ইত্যাদি।

(৩) সংসদের পক্ষে তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল তথ্য। সংসদ বিভিন্নভাবে এই তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন উৎস থেকে, তবে সবচেয়ে বড় উৎস হল সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা বিভাগ। সরকারের কাছ থেকে, তথ্যের দাবি চাওয়া সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। একমাত্র জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন তথ্য ছাড়া সংসদের তথ্যসংগ্রহের অধিকার প্রায় অবাধ। সরকারেরও কর্তব্য হল সংসদকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সঠিক এবং পরিপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা। সরকারি নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে সদস্যগণ মন্ত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। বিভাগীয় মন্ত্রীদের এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। তাঁরা উভয় কক্ষেই বিবৃতি দেন, বিভিন্ন রিপোর্ট, দলিল ও কাগজপত্র সভায় পেশ করেন। এই সব নিয়েই সংসদের মূল্যবান তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হয় যা সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং সংসদের আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

(৪) আধুনিক গণতন্ত্রে আইনসভার প্রাথমিক কাজ হল জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং জনগণের অভাব অভিযোগ প্রকাশ করা। আইনসভা জনগণের এক সর্বোচ্চ রাজনৈতিক মঞ্চ যেখানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগের প্রতিফলন ঘটে। ভারতের সংসদও ঠিক এই ভূমিকাই পালন করে আসছে।

তাছাড়া সংসদের একটা শিক্ষামূলক ভূমিকাও আছে। সংসদের একজন সদস্যকে সংসদের কাজকর্ম ভাল করে বুঝতে হয় এবং সেই কাজকর্মে এবং বিতর্কে তাকে অংশ গ্রহণ করতে হয় যাতে সে তার নির্বাচনী এলাকার জনগণকে জানাতে পারে বা বোঝাতে পারে সংসদের প্রকৃত ভূমিকা কি। তাঁর নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কেও তাকে ওয়াকিবহাল হতে হয় যাতে সে বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সেই সমস্যা সংসদে তুলে ধরতে পারেন।

সংসদের কিছু পরামর্শদান ভূমিকাও আছে। সংসদের বিতর্ক প্রশাসনের উপরেও প্রভাব ফেলে। যদিও রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্য ও আমলারা স্বাধীনমত মন্ত্রীসভা কর্তৃক গৃহীত ও সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতি কার্যকর করে, তবুও তারা সংসদীয় বিতর্ক ও সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাদের নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।

(৫) সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন মত, পথ ও স্বার্থের যে সংঘাত দেখা দেয় তার নিরসন ঘটে সংসদে। এই নিরসনের জন্য প্রয়োজন হলো বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। সংসদের এই ভূমিকা ভারতের মত বহুত্ববাদী সমাজের পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

(৬) আইন প্রণয়ন করাই হল সংসদের প্রধান কাজ। সংবিধান অনুসারে সংসদ কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়, অবশিষ্ট বিষয় এবং কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেও আইন প্রণয়ন করে। আজকের কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনসাধনের মাধ্যমে যাতে জনগণের সার্বিক মঙ্গল সাধিত হতে পারে সেজন্য সংসদকে বিভিন্ন ধরনের সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করতে হয়। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সংসদ সর্বদা প্রকৃত অর্থে আইন প্রণয়ন করে না। শুধু শাসনবিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রীসভা কর্তৃক উত্থাপিত আইনের প্রস্তাবে আলোচনার পর সম্মতি দেয় মাত্র।

(৭) আইন প্রণয়ন ছাড়াও সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারা অনুসারে সংসদের হাতে সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতা বলে সংসদ সংবিধান সংশোধন করে। ঐ ধারায় বর্ণিত সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন — (ক) সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি 'বিল' সংসদে উত্থাপন করতে হবে। তার মানে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ একমাত্র সংসদই নিতে পারে। (খ) সংবিধানের বেশিরভাগ অংশই সংসদের উভয় কক্ষের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংশোধন করা যায়। ব্যতিক্রম শুধু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলি সংশোধনের জন্য ঐ বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াও অন্তত অর্ধেক রাজ্য আইনসভার অনুমোদন দরকার হয়। (গ) প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস এবং রাজ্যগুলির দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর সংশোধনী প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে এবং তিনি তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকবেন অন্যান্য বিলের মত। তিনি তা প্রত্যাখ্যান বা সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন না। পরিশেষে, (ঘ) সংবিধানের কোন অংশই অসংশোধনীয় নয়; তবে সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংসদ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে ধ্বংস করতে পারে না (কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য, ১৯৭৩)।

(৮) সংসদ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুশীলনভূমি হিসাবে কাজ করে। জাতীয় ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দ এখান থেকেই নিযুক্ত হন।

০৭.৯ লোকসভার স্পীকার

যে কোন সভা সুশৃঙ্খলভাবে চলতে হলে সভার কাজকর্ম ও নিয়মকানুন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন আছে। লোকসভার এই কর্তৃপক্ষ হলেন স্পীকার।

লোকসভার স্পীকারের পদ অত্যন্ত সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতার পদ। লোকসভাকে যদি জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চরূপে গণ্য করা হয়, তাহলে স্পীকার হলেন সেই মঞ্চের প্রধান পরিচালক ও অভিভাবক। লোকসভার স্পীকার পদের উপলব্ধি করেই মর্যাদার দিক থেকে এই পদকে ভারতে সপ্তম স্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর পদমর্যাদা ভারতের প্রধান বিচারপতির সমান।

ব্রিটেনের কমন্সসভার স্পীকারের অনুকরণে লোকসভার স্পীকারের পদ সৃষ্টি করা হলেও প্রধানত দুটি দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, কমন্সসভার স্পীকারের উৎপত্তি ও বিকাশ যেরূপ প্রথাগতভাবে হয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে হয়নি। ভারতের লিখিত সংবিধানে বিভিন্ন ধারায় স্পীকারের নিয়োগ, ক্ষমতা, কার্যাবলী ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কমন্সসভার স্পীকারের পদের জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করে একজনকে সর্বসম্মতিক্রমে স্পীকার পদে নির্বাচিত করে। শুধু তারা নয় ব্রিটেনের স্পীকারের দলনিরপেক্ষতার উপর এতই জোর দেওয়া হয় যে কমন্সসভার পরবর্তী নির্বাচনেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দেওয়া হয় না। ভারতে এখনও এই ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। পূর্বতন স্পীকারগণকে দলীয় প্রার্থী হিসাবে পুননির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়।

স্পীকারের যোগ্যতা, নির্বাচন ও কার্যকাল ঃ

সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী স্পীকারকে লোকসভার সদস্য হতে হয়। সুতরাং লোকসভার সদস্য হতে হলে যে সব যোগ্যতা থাকা দরকার স্পীকারকেও অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। নব নির্বাচিত লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পীকার ও আর একজনকে ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করে। ভারতে স্পীকার নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়।

লোকসভার স্পীকারের কার্যকাল সম্পর্কে সংবিধানে কিছু উল্লেখ করা হয় নি তবে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ যতদিন থাকে স্পীকারও ততদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং তিনি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য কতকগুলি কারণে কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই তাঁর পদ খালি হতে পারে। যেমন, লোকসভার সদস্যপদ বাতিল হওয়া, পদত্যাগ এবং অপসারণ। তবে অপসারণের উদ্দেশ্যে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করতে হলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয় এবং ঐ অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার সময় তিনি সভাপতিত্ব করেন না। লোকসভার কার্যকাল শেষ হলে, কিংবা লোকসভা ভেঙে দেওয়া হলে পরবর্তী লোকসভা গঠনের পূর্ব পর্যন্ত স্পীকার তাঁর পদে আসীন থাকেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় লোকসভার স্পীকারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ক্ষমতা বহু ও বিভিন্ন। স্পীকারের যাবতীয় ক্ষমতার উৎস ভারতের সংবিধান এবং লোকসভার কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মবিধি। স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে—

(১) লোকসভার সভাপতিত্ব করা এবং অধিবেশন পরিচালনা করা ঃ

স্পীকার লোকসভার সভাপতিত্ব করেন এবং সভার কাজ পরিচালনা করেন। তিনি সংবিধান এবং লোকসভার নিয়মকানুনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা। যে কোন সংসদীয় বিষয়ে স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তাঁর কোন সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করা কিংবা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। সভায় ন্যূনতম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না থাকলে তিনি কোরামের অভাবে সভার কাজ মুলতুবি বা স্থগিত রাখতে পারেন।

স্পীকার লোকসভার বিতর্ক ও আলোচনা নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভার নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি লোকসভার কর্মসূচী স্থির করেন। প্রয়োজন হলে তিনি বিরোধী দলের নেতার সঙ্গেও পরামর্শ নেন। সংখ্যালঘু সদস্যদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব স্পীকারের উপর ন্যস্ত থাকে। তিনি সভার নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা করেন এবং বৈধতার প্রশ্নের মীমাংসা করেন। কোন বিষয়ে আলোচনার পর যদি ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি ভোট গ্রহণ করেন। ভোটের ফলাফল তিনিই ঘোষণা করেন। স্পীকার নিজে কোন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন না। তিনি ভোটাভুটিতেও অংশগ্রহণ করেন না। তবে কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি তাঁর নির্ণায়ক ভোট (Casting vote) দিয়ে অচল অবস্থার অবসান ঘটাতে পারেন।

(২) সভার শৃঙ্খলা ও মর্যাদা রক্ষা করা ঃ

স্পীকারকে লোকসভার শৃঙ্খলা ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। সুতরাং তাঁকে সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সভায় বক্তৃতা দিতে হলে কিংবা কোন বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে প্রত্যেক সদস্যকেই স্পীকারের অনুমতি নিতে হয়। কোন সদস্য তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন বক্তব্য পেশ করলে বা সংসদীয় রীতি বহির্ভূত কোন বক্তব্য পেশ করলে তিনি সভার কার্য-বিবরণী থেকে সেই বক্তব্য বাতিলের নির্দেশ দিতে পারেন। একাধিক সদস্য একই সঙ্গে বক্তৃতা দিতে চাইলে কোন্ সদস্য আগে বলবেন তা তিনি স্থির করে দেন। তিনি স্থির করেন কিভাবে বক্তৃতা দেওয়া হবে; অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য, পুনরাবৃত্তি কিংবা অশালীন মন্তব্য তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। সভায় কোন সদস্য শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে কিংবা আপত্তিকর আচরণ করলে স্পীকার তাঁকে সংযত হওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন, কিংবা চরম অবস্থায় তিনি তাঁকে সভা থেকে বহিষ্কার বা কিছুদিনের জন্য সাসপেন্ড করতে পারেন। সভায় বিশৃঙ্খলা হৈ হট্টগোল দেখা দিলে তিনি সভা মুলতুবি কিংবা স্থগিত রাখতে পারেন।

(৩) সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ করা ঃ

সভায় অধিকার ভঙ্গের বিষয়ে স্পীকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সভার অবমাননার জন্য কোন সদস্য বা ব্যক্তিকে তিনি গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে পারেন। সভার এলাকার মধ্যে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার বা তাঁর বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্পীকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। আর এলাকার বাইরে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করলে বিষয়টা স্পীকারকে তৎক্ষণাৎ জানাতে হয়।

(৪) স্পীকারের বিশেষ ক্ষমতা ঃ

স্পীকার কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন। যেমন—

(ক) কোন অর্থ বিল কি না তা চূড়ান্তভাবে স্থির করেন এবং অর্থবিল হলে ঐ মর্মে একটি প্রমাণপত্র দেন।

(খ) সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন;

(গ) দলত্যাগ বিরোধী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করা;

(ঘ) ৩৩-তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে কোন সদস্যের পদত্যাগ বলপূর্বক আদায় করা হয়েছে কি না তার অনুসন্ধান করা।

লোকসভার মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতীক হলেন স্পীকার। যেহেতু লোকসভা সমগ্র জাতির প্রতিনিধি, সেহেতু স্পীকারও জাতীয় স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রতীক। তাই দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে লোকসভার কার্যাদি পরিচালনা করা স্পীকারের কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে স্পীকারের দলনিরপেক্ষতার কোন স্পষ্ট ঐতিহ্য এখনও গড়ে ওঠেনি।

০৭.১০ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

আইন প্রণয়ন সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যদিও আইন প্রণয়ন ছাড়াও সংসদকে আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। আইন প্রণয়নের জন্য আইনের খসড়া প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করতে হয়। আইনের এই খসড়া প্রস্তাবকে বিল (Bill) বলে। বিল প্রধানত দুরকমের : (ক) সরকারি বিল (Govt Bill) এবং (খ) বে-সরকারি বিল (Private Member's Bill)। যে বিল কোন মন্ত্রী উত্থাপন করেন তাকে সরকারি বিল বলে; আর যে বিল সংসদের কোন সাধারণ সদস্য উত্থাপন করেন তাকে বে-সরকারি বিল বলে। বেশিরভাগ বিলই সরকারি বিল, অর্থাৎ কোন না কোন মন্ত্রী উত্থাপন করেন। সরকারি বিল আবার দু'রকম হতে পারে — অর্থবিল (Money Bill) ও সাধারণ বিল (Ordinary Bill)। তা ছাড়াও রয়েছে আর এক ধরনের বিল — সংবিধান সংশোধন বিল। কারণ সংবিধান সংশোধন করতে হলে ঐ উদ্দেশ্যে একটি বিল সংসদে উত্থাপন করতে হয়।

সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতি

সংবিধান সংশোধন বিল ও অর্থবিল ছাড়া বাকি সবই সাধারণ বিল। সাধারণ বিল, তা সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক, সংসদের যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। বে-সরকারি বিল উত্থাপনের জন্য 'বে-সরকারি বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত কমিটি'র সুপারিশ প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি বিলের ক্ষেত্রে এ সবের দরকার হয় না। কোন বিষয়ে বিল উত্থাপন করা হবে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের অনুমোদনের পর প্রস্তাবাকারে সংসদের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করেন। যে কোন সাধারণ বিলকে সংসদে কয়েকটি স্তর বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। সংসদ কর্তৃক পাস হওয়ার পর বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে আইনে পরিণত হয়। এই পর্যায়গুলি হল —

(১) উত্থাপন ও প্রথম পাঠ :

সভার অনুমতি নিয়ে বিলের উত্থাপক বিলটি উত্থাপন করেন। এই পর্যায়ে বিলটির উপর কোন আলোচনা বা বিতর্ক হয় না। শুধু বিলটির শিরোনাম পাঠ করা হয়। একেই বিলের প্রথম পাঠ বলা হয়। এরপর বিলটি সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(২) দ্বিতীয় পাঠ :

বিলটির প্রথম পাঠ শেষ হওয়ার কয়েকদিন পর দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয়। দ্বিতীয় পাঠ বিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, কারণ এই পর্যায়েই বিলটির নীতি, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিবেচনা হয়।

দ্বিতীয় পাঠের শুরুতে উত্থাপক বিলটিকে একটি সিলেক্ট কমিটিতে অথবা উভয় কক্ষের যৌথ কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করতে পারেন। কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব ছাড়াও তিনি আরও দুটি বিকল্প প্রস্তাব করতে পারেন—বিলটির উপর জনমত গ্রহণের জন্য পাঠানো, অথবা বিলটি সরাসরি সভা কর্তৃক বিবেচনার জন্য

গ্রহণের প্রস্তাব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিল সরাসরি কক্ষ কর্তৃক বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয় এবং তার জন্য একটি দিন স্থির করা হয়।

(৩) কমিটি পর্যায় ঃ

কোনো বিলকে সিলেক্ট কমিটি বা যৌথ কমিটিতে পাঠানো হলে কমিটি বিলটির ধারা উপধারা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং প্রয়োজন মনে করলে বিলের বিভিন্ন ধারা-উপধারার সংশোধন করার সুপারিশ করতে পারে। কমিটি বিলটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে, বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থের প্রতিনিধিদের মতামত শুনতে পারে। তবে কমিটি বিলটির মূল নীতি ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারে না। বিলটির বিচার-বিবেচনার পর কমিটি তার সুপারিশ সম্বলিত একটি রিপোর্ট বিলটির উত্থাপক সভায় পেশ করে।

(৪) রিপোর্ট পর্যায় ঃ

কমিটির রিপোর্ট কক্ষে আসার পর বিলটির উত্থাপক যে কোন একটি বিকল্প প্রস্তাব করতে পারেন; (ক) কমিটির রিপোর্ট সহ বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণের প্রস্তাব; (খ) বিলটি পুনরায় সেই কমিটির কাছে কিংবা নতুন কোন কমিটির কাছে পাঠানোর প্রস্তাব এবং (গ) জনমত গ্রহণের জন্য পাঠানোর প্রস্তাব। সাধারণত প্রথম প্রস্তাবই গৃহীত হয় এবং তখন বিলটির বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা হয়। এই পর্যায়ে বিভিন্ন ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় এবং তা নিয়ে আলোচনা হয় এবং ভোটাভুটির পর সভা কর্তৃক গৃহীত হয় অথবা প্রত্যাখ্যাত হয়।

(৫) তৃতীয় পাঠ ঃ

এই পর্যায়ে বিলের ধারা-উপধারার উপর কোন কোনরূপ আলোচনা বা বিতর্ক হয় না। কোনো সংশোধনীও গৃহীত হয় না শুধুমাত্র কিছু মৌখিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। এই পর্যায়ে বিলটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়।

সংসদের একটি কক্ষ কর্তৃক বিলটি গৃহীত হওয়ার পর অপর কক্ষে প্রেরণ করা হয়। সেই কক্ষেও বিলটিকে পূর্বোক্ত প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। অপর কক্ষ বিলটি সম্পর্কে তিনটির যেকোন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে—

(ক) বিলটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষের মধ্যে অচল অবস্থা দেখা দেবে।

(খ) কক্ষটি সংশোধন ছাড়াই বিলটিকে পাস করতে পারে। সেক্ষেত্রে বিলটি উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হল। এরপর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য বিলটিকে পাঠানো হবে।

(গ) আর যদি বিলটির উপর সংশোধনী পস্তাব আনয়ন করে তাহলে ঐ সংশোধনে উভয় কক্ষের সম্মতি থাকতে হবে। তা নাহলে উভয় কক্ষের মধ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে।

উভয় কক্ষের মধ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৮(১) নং ধারা অনুসারে উভয়

কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করে বিতর্কিত বিলটি ভোটে দেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলটি গৃহীত হলে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিল আইনে পরিণত হয় না। তিনি সম্মতি দিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। অসম্মতি দিলে বিলটি আর আইনে পরিণত হয় না। রাষ্ট্রপতি সম্মতি বা অসম্মতি কোনোটিই না দিয়ে বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন। তবে অর্থবিল ফেরত পাঠানো যায় না। পুনর্বিবেচনার পর বিলটি আবার যদি উভয়সভা কর্তৃক গৃহীত হয় তাহলে তাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

অর্থবিল পাসের পদ্ধতি

অর্থবিল পাসের পদ্ধতি সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতি থেকে কিছুটা আলাদা। সংবিধানের ১১০ নং ধারায় অর্থবিলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা আছে যে বিলের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কর সরকারি ঋণ, সঞ্চিত তহবিল বা আকস্মিকতা তহবিল বা এর যে কোন একটি বিষয় বা আনুষঙ্গিক বিষয় জড়িত থাকে তাকে অর্থবিল বলে। তবে সংবিধানে বলা আছে বিল অর্থবিল কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে লোকসভার স্পীকারে'র সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

অর্থবিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না, কেবল লোকসভাতেই উত্থাপন করতে হয় রাষ্ট্রপতির সুপারিশক্রমে। অর্থবিল মাত্রই সরকারি বিল। লোকসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর অর্থবিল রাজ্যসভায় পাঠানো হয় অনুমোদনের জন্য। অর্থবিলের ব্যাপারে রাজ্যসভার কোন ক্ষমতা নেই বললেই হয়। রাজ্যসভা এই বিল প্রত্যাখ্যান করতে পারে না কিংবা সংশোধনও করতে পারে না। রাজ্যসভা অবশ্যই ১৪ দিনের মধ্যে অর্থবিল অনুমোদন দেবে অথবা সুপারিশ পাঠাবে, যে সুপারিশ লোকসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। ঐ ১৪ দিনের মধ্যে অর্থবিল রাজ্যসভা পাস না করলে কিংবা সুপারিশ লোকসভায় না পাঠালে ধরে নেওয়া হবে অনুমোদন দিয়েছে। সুতরাং অর্থবিল নিয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধের কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

সংবিধান সংশোধন বিল পাসের পদ্ধতি

সংবিধান সংশোধন করতে হলে ঐ উদ্দেশ্যে একটি বিল সংসদের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করতে হয়। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে সংবিধানের বিভিন্ন ধারাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে—

(ক) যে ধারাগুলি সংশোধন করতে হলে সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার হয়। অর্থাৎ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতেই এই ধারাগুলির সংশোধন করা যায়। যে বিষয়গুলি এই পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় সেগুলি নতুন রাজ্য গঠন, রাজ্য পুনর্গঠন, রাজ্যের সীমানা কিংবা নাম পরিবর্তন, রাজ্য আইনসভা উচ্চকক্ষ গঠন বা বিলোপসাধন ইত্যাদি।

(খ) যে ধারাগুলি সংশোধন করতে হলে সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন (বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা) দরকার হয়। সংবিধানের মৌলিক অধিকার, নির্দেশাত্মক নীতিসহ সংবিধানের বেশিরভাগ অংশই এই পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়।

(গ) সংবিধানের কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলির সংশোধনের জন্য সংশোধনী প্রস্তাবকে সংসদের উভয় সভায় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হওয়ার পর বিলটিকে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার অন্তত অর্ধেকের দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। এই বিষয়গুলি হল রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কেন্দ্র-রাজ্য আইন ও শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ইত্যাদি।

সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব সংসদ অথবা সংসদ ও রাজ্যবিধানসভাগুলি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দরকার হয়। তবে সংবিধান সংশোধন বিলে রাষ্ট্রপতি অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন না।

ভারতের সংবিধান লিখিত। এই লিখিত সংবিধান দ্বারা সংসদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সংবিধান নির্দিষ্ট এই গণ্ডীর মধ্যে থেকেই সংসদকে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়।

পরিশেষে, ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় হওয়ায় রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা সংসদ ও রাজ্যআইনসভার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টিত হয়। এরফলে কোন আইন সভাই এককভাবে আইন প্রণয়নের সকল ক্ষমতার অধিকারী নয়।

০৭.১১ সংসদের ক্ষমতা হ্রাস

বিভিন্ন কারণে ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এই কারণগুলি হল—

(১) সংসদের ক্ষমতাহ্রাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হল অর্পিত আইনের (Delegated Legislation) সংখ্যা ও পরিধিবৃদ্ধি। বর্তমানের জনকল্যাণকর রাষ্ট্র এত বেশি সংখ্যায় আইন প্রণয়ন করতে হয় এবং আইন প্রণয়নে এত বেশি মাত্রায় বিশেষ আইনের দরকার হয় যে সময় ও জ্ঞানের অভাবে সংসদের পক্ষে এককভাবে এই সমস্ত আইন সম্পূর্ণভাবে প্রণয়ন করতে পারে না। তাই সংসদ আইনের মূল নীতিগুলি নির্ধারণ করে দেয় এবং আইনটির পরিপূর্ণরূপ দেওয়ার ভার শাসনবিভাগের উপর অর্পণ করে। এই সমস্ত আইনগুলিকেই অর্পিত আইন বলে। সুতরাং আইনের প্রস্তাবগুলিতে এমন ব্যবস্থা থাকে যার মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত নিয়মকানুন বা উপ-আইন তৈরি করে নিতে পারে। সুতরাং অর্পিত আইন বহুলাংশে সংসদের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

(২) তত্ত্বগতভাবে ভারতীয় সংসদ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হলেও কার্যক্ষেত্রে মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেটই সংসদের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। সংসদের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন হলেও এ ব্যাপারে মন্ত্রীরাই সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রায় সমস্ত বিলই মন্ত্রীরাই উত্থাপন করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিলগুলি সহজেই পাস হয়ে যায়। দলীয় নিয়মানুবর্তিতার কঠোরতার জন্য সাধারণ সদস্যরা বিলটির পক্ষে ভোট না দিয়ে পারেন না। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙে দেওয়ার ভয় দেখিয়েও সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বস্তুত, সংবিধানে সংসদের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে সে সব ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের ক্ষমতার রূপান্তরিত হয়েছে। তাই অনেকে অভিযোগ করেন যে ব্রিটেনের মত ভারতেও ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব (Cabinet Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৩) বর্তমানে ভারতের সংসদে অযোগ্য সদস্যদের আধিক্য, সদস্যদের উচ্ছৃঙ্খল ও অশোভন আচরণ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচার বিবেচনার সময় মন্ত্রীদের এবং সদস্যদের অনুপস্থিতি, সংসদের প্রতি কোন কোন প্রধানমন্ত্রীর চরম অবহেলার মনোভাব, অনেক ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি প্রায়ই সংসদে আলোচনা ছাড়াই গ্রহণ — এ সবই বর্তমান ভারতের পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এগুলি নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে।

০৭.১২ সারাংশ

ভারতের পার্লামেন্টীয় শাসন ব্যবস্থা সংসদের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের মাধ্যমেই ভারতীয় জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। ভারতের সংসদ দ্বি—কক্ষবিশিষ্ট —উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ লোকসভা এই দুটি কক্ষ নিয়ে সংসদ গঠিত। অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত। এরমধ্যে ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। বাকি সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাজ্যসভা স্থায়ী কক্ষ। সদস্যরা ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হলেও প্রতি দু'বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন, এবং শূন্য পদগুলির জন্য নির্বাচন হয়। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতি।

লোকসভার সদস্য সংখ্যা অনধিক ৫৫২। এই সভা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত। তবে কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি একে ভেঙে দিতে পারেন। সভার সভাপতিত্ব করার জন্য সদস্যগণ একজনকে স্পীকার এবং আর একজনকে ডেপুটি স্পীকারপদে নির্বাচিত করেন। স্পীকার সভার কাজ পরিচালনা করেন, সভার শৃঙ্খলা ও মর্যাদা রক্ষা করেন, সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং অর্থবিল নির্ধারণ করেন।

সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিভিন্ন; যেমন জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা, আইন প্রণয়ন করা, শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা, জাতীয় অর্থের তদারকি করা, সংবিধান সংশোধন করা, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণ করা ইত্যাদি। সর্ব ক্ষেত্রে দুটি কক্ষকে সমান ক্ষমতা অর্পণ করা হয় নি। অর্থবিষয়ক ক্ষমতা এবং মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে অপসারণ করার ক্ষমতা একমাত্র লোকসভাকে দেওয়া হয়েছে। অর্থবিল ছাড়া যে কোন সাধারণ বিল উভয় কক্ষে উত্থাপন করা যায় এবং উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তবেই তা আইনে পরিণত হয়। সাধারণ বিল নিয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আহুত উভয় কক্ষের এক যৌথ অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তার নিষ্পত্তি হবে।

অর্থবিল ও বাজেট লোকসভায় উত্থাপিত হয়। রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। আনুমানিক ব্যয় কমিটি, সরকারি হিসাব পরীক্ষা কমিটি করে লোকসভা সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর নিজ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করে।

সাধারণভাবে লোকসভার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও সংবিধান জাতীয় স্বার্থে

রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব এবং সর্বভারতীয় কৃত্যক গঠনের প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা রাজ্যসভাকে দিয়েছে।

সংসদে আইন প্রণয়নের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। বিলের প্রকারভেদে এই পদ্ধতির কিছুটা হের-ফের হয়। সংসদে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিল উত্থাপিত হয়। বিলটি উভয় কক্ষে কতকগুলি পর্যায় অতিক্রম করার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে আইনে পরিণত হয়।

ভারতের সংসদের সঙ্গে শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং রাজ্য আইনসভার সম্পর্ক আলোচনা করলে সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর প্রকৃতি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

ভারতের পার্লামেন্টীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভাকে নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত, যদিও শাসন বিভাগের একটি অরাজনৈতিক অংশও আছে যা গঠিত হয় সরকারি কর্মচারী ও আমলাদের নিয়ে। রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করে তাঁর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রীদের সংসদের সদস্য হতে হয়। মন্ত্রীসভার কার্যকাল নির্ভর করে লোকসভার আস্থার উপর। বিভিন্ন সংসদীয় উপায়ে লোকসভা শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অবশ্য মন্ত্রীসভার পেছনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকলে মন্ত্রীসভাই সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ভারতের আদালতসমূহের স্থাপন, গঠন, এক্তিয়ার ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের আছে। সংবিধান সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যেই একটি করে হাইকোর্ট আছে, তবে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি সাধারণ হাইকোর্ট স্থাপন করার ক্ষমতা সংসদের আছে। বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাবলে বিচারবিভাগ সংবিধানভঙ্গের অভিযোগে সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোন আইনকে বাতিল করে দিতে পারে। বিচারবিভাগ যখন সংসদের কোন আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে তখন সংসদ সেই আইনের ত্রুটি দূর করে পুনরায় সেই আইন পাস করতে পারে অথবা সংবিধান সংশোধন করে আগের বাতিল করা আইনটিকেই পুনরায় পাস করে বৈধ করে নিতে পারে।

ভারতে সংসদ ও রাজ্য আইনসভার সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই সংসদের প্রাধান্য স্বীকৃত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি তালিকার মাধ্যমে আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে — কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। সংসদ কেন্দ্রীয় তালিকা, যুগ্ম তালিকা ও অবশিষ্ট বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য আইনসভার হলেও সংসদ কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় এই বিষয়গুলির উপরেও আইন প্রণয়নের অধিকারী।

ভারতের লিখিত সংবিধান সংসদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সংসদ সার্বভৌম। সংসদ সংবিধানের যে কোন ধারা মোটামুটি সহজেই পরিবর্তন করতে পারে, যদিও সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না (১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়)।

পরিশেষে ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা ও মর্যাদা নানা কারণে হ্রাস পেয়েছে। তাহলেও সংসদ ভারতীয় রাজনীতির এক অদ্বিতীয় মঞ্চ যেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয় এবং সরকারি নীতি ও কাজকর্মের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা হয়।

০৭.১৩ অনুশীলনী

(১) রাজ্যসভার গঠন আলোচনা করুন।

(২) অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার ক্ষমতা কী?

(৩) রাজ্যসভার দুটি অনন্য ক্ষমতা উল্লেখ করুন।

(৪) সংসদের দুটি কক্ষের মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(৫) সংসদের উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন কখন অনুষ্ঠিত হয়?

(৬) সংসদে সংবিধান সংশোধন বিল কিভাবে পাস হয়?

(৭) সংসদের ক্ষমতা হ্রাসের কারণ কী?

০৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Subhash C. Kashyap, *Our Parliament,* National Book Trust, India, 1989, New Delhi.

(২) S. L. Sikri, *Indian Government and Politics,* Kalyani Publishers, 1989, New Delhi.

(৩) নিমাই প্রামাণিক, ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৭ কলকাতা।

(৪) অনাদি কুমার মহাপাত্র— ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।

একক ০৮ ❐ ভারতের বিচার বিভাগ

গঠন

০৮.১ উদ্দেশ্য

০৮.২ প্রস্তাবনা

০৮.৩ ভারতের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

০৮.৪ ভারতের বিচার ব্যবস্থার কাঠামো

০৮.৫ সুপ্রিম কোর্ট

গঠন ও নিয়োগ

যোগ্যতা

কার্যকাল ও অপসারণ

বেতন ও ভাতা

স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(১) মূল এলাকা

(২) আপীল এলাকা

(৩) পরামর্শদান এলাকা

(৪) নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারি করার এলাকা

(৫) অন্যান্য ক্ষমতা

বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা

সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা

০৮.৬ হাইকোর্ট

০৮.৭ অধস্তন আদালত

০৮.৮ সারাংশ

০৮.৯ অনুশীলনী

০৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

০৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনারা ভারতের বিচার ব্যবস্থার গঠন, এলাকা ও কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন। বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে এই এককে তা হল—

- ভারতের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো
- সুপ্রিম কোর্টের গঠন, এলাকা ও কার্যাবলী
- হাইকোর্ট ও অধস্তন আদালতের কার্যাবলী

০৮.২ প্রস্তাবনা

সংবিধানপ্রনেতাগণ সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে যতটা যত্নবান ছিলেন বিচারব্যবস্থা রচনার ক্ষেত্রেও তাঁরা সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বিচারব্যবস্থাকে মৌলিক অধিকারেরই একটা সম্প্রসারিত রূপ হিসাবে দেখেছেন, কারণ একমাত্র নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বিচার ব্যবস্থাই মৌলিক অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অস্তিত্ব অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। এই আদালত স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টই এই ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে বিচার বিভাগের, স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

এই এককে আমরা বিচার বিভাগের গঠন, বিচারকদের নিয়োগ যোগ্যতা, কার্যকাল, বেতন-ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলি নিয়ে আলোচনা করবো। এই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের মূল, আপীল ও পরামর্শদান এলাকা সহ অন্যান্য ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং হাইকোর্ট ও অধস্তন আদালতগুলির এক্তিয়ার নিয়েও আমরা আলোচনা করবো।

০৮.৩ ভারতের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ভারতের বিচার ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানে দ্বৈত বিচারব্যবস্থা অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদা বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অখণ্ড বিচারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই গোটা ব্যবস্থার শীর্ষে আছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নীচে আছে বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট এবং প্রত্যেক হাইকোর্টের নীচে আছে অন্যান্য অধস্তন আদালত।

(২) সমগ্র দেশে একই ধরনের দেওয়ানি ও ফৌজদারী আইন অনুসারে বিচার কার্য সম্পাদিত হয়।

(৩) ভারতের বিচার ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট শীর্ষস্থানে অবস্থিত হলেও তার ক্ষমতা মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের তুলনায় বহুলাংশে সীমিত। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট শুধুমাত্র আইনের পদ্ধতিগত দিক বিচার করতে পারে।

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় ও আইনের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে না। তাছাড়া সংসদ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের রায় অতিক্রম করতে পারে।

(৪) ভারতে সাধারণভাবে 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের' নীতি গৃহীত হলেও সংবিধানে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা আছে। স্বপদে থাকাকালীন তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায় না। সংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরা কোন আদালতের কাছে দায়িত্ববদ্ধ নন।

(৫) ভারতে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত না হলেও শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে মুক্ত রাখার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে।

(৬) ভারতের বিচার-ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়-বহুল এবং সময় সাপেক্ষ।

(৭) ভারতের জুরির সাহায্যে বিচারের নীতি গৃহীত হয় নি।

০৮.৪ ভারতে বিচার ব্যবস্থার কাঠামো

সুপ্রিম কোর্ট

রাজ্যের হাইকোর্টসমূহ

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জুডিসিয়াল কমিশনারের আদালত

জেলা আদালত ও দায়রা জজের আদালত

বৃহৎ প্রেসিডেন্সি শহরের আদালত

দেওয়ানি সাব-জজের আদালত

ছোট আদালত

ফৌজদারী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

দেওয়ানির ফৌজদারী আদালত

ক্ষুদ্র আদালত

মুন্সেফের আদালত

ন্যায় পঞ্চায়েত

সাব-জজের আদালত

পঞ্চায়েত আদালত

বেতনভোগী বিচারপতিদের আদালত

অবৈতনিক বিচারপতিদের আদালত

০৮.৫ সুপ্রীম কোর্ট

ভারতের ক্রম-স্তর-বিন্যস্ত অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তকে হাইকোর্ট সমেত ভারতের সকল স্তরের অন্যান্য আদালতের মেনে নিতে হয়। এর রায় আইন হিসাবে গণ্য হয়। সংবিধানের ১২৪ নং - ১৪৭ নং ধারাগুলিতে সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গঠন ও নিয়োগ

সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের সংখ্যা স্থির করে। বর্তমানে ১ জন প্রধান বিচারপতি এবং ২৫ জন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। এই ২৬ জন বিচারপতি ছাড়াও সংবিধানে অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

সুপ্রীমকোর্টের বিচারকগণ রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। বিচারক নিয়োগের আগে তাঁকে সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বলে মনে করবেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। তবে অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের সময় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক। তবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের মত, প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুসারেই চলেন।

যোগ্যতা

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হতে গেলে প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং তাঁকে কমপক্ষে ৫ বছর কোন হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে কাজ করতে হবে অথবা অন্তত ১০ বছর হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করতে হবে অথবা রাষ্ট্রপতির মতে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হতে হবে।

কার্যকাল ও অপসারণ

সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন যদি না কোন বিচারপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চান।

সংবিধানে বিশেষ কারণে বিচারককে অপসারণ করার ব্যবস্থা আছে। অসদাচরণ বা অসামর্থের অভিযোগ সংসদের উভয় সভায় মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি কোন বিচারককে অপসারণ করতে পারেন।

বেতন ও ভাতা

বিচারপতিদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি পার্লামেন্টে প্রণীত আইনের মাধ্যমে স্থিরীকৃত। ১৯৮৩ সালে প্রণীত ৫৪-তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ যথাক্রমে মাসিক ১০,০০০ ও ৯০০০ টাকা বেতন এবং অবসরকালে মাসিক ৫০০০ ও ৪০০০ টাকা

পেনশন পান। তাছাড়া অন্যান্য ভাতা এবং বিনা ভাড়ায় সরকারি বাসভবনের সুযোগ সুবিধা তাঁরা ভোগ করেন।

স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা

গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপর। বিচারকগণ নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন না হলে তাঁদের কাছ থেকে ন্যায়বিচার আশা করা যায় না। সেজন্য ভারতের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করার জন্য সংবিধান কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে—(১) সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ যাতে রাজনীতি-মুক্ত ও পক্ষপাতশূন্য হতে পারে সেজন তাঁদের নিয়োগের ভার রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির এই নিয়োগসংক্রান্ত ক্ষমতা আবার বিচারবিভাগীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগের ব্যাপারে বিচারবিভাগের সঙ্গেই পরামর্শ করতে হয়।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিচারপতিদের যোগ্যতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বল্প যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণই প্রলোভন ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি আকৃষ্ট হন। ভারতের সংবিধানের ১২৪ (৩) ধারায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের যোগ্যতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে বিচারপতিকে হাইকোর্টে বিচারপতি হিসাবে কাজ করার ৫ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করার ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অর্থাৎ বিচারকদের বিচার-বিভাগীয় অভিজ্ঞতা ও আইনগত যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(৩) কার্যকালের স্থায়িত্ব ব্যতীত বিচারপতিদের পক্ষে নির্ভীকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। সেজন্য ভারতের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বর্ণিত আছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বছর এবং এবং হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ৬২ বছর পর্যন্ত স্বপদে আসীন থাকেন। একমাত্র প্রমাণিত অসদাচরণ কিংবা অসামর্থ্য-জনিত কারণে আনীত ইম্‌পিচমেন্ট প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্যের অধিকাংশ ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা গৃহীত হলে তবেই কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দ্বারা অপসারিত হবেন।

(৪) বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা তাঁদের বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উপর অনেকাংশে নির্ভশরশীল। তাঁদের আর্থিক অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে না পারলে তাঁরা শাসন বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন। ভারতের সংবিধান এব্যাপারেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিচারকদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যয় পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ নয়। ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে ঐ ব্যয় নির্বাহ করা হয়। তাছাড়া বিচারকদের বেতন ও ভাতা সাধারণ অবস্থায় হ্রাস করা যায় না।

(৫) অবসর গ্রহণের পর সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি ভারতের কোন আদালতে আইনজীবী হিসাবে কাজ করতে পারেন না। তাছাড়া অবসর গ্রহণের পর কোন সরকারি পদে তাঁরা নিযুক্ত হতে পারেন না।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে যথা—(ক) মূল এলাকা (খ) আপীল এলাকা (গ) পরামর্শদান এলাকা, (ঘ) নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারি করার এলাকা।

(১) মূল এলাকা ঃ সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বৈত সরকারি ব্যবস্থা যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের আইনগত ক্ষমতা সংবিধানে নির্দিষ্ট থাকে। সংবিধানের ১৩১ নং ধারা অনুসারে আইনগত অধিকারের প্রশ্নে উভয় সরকারের মধ্যে কিংবা দুটি রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা বিচারের অনন্য ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকায় হয়। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে সুপ্রীম কোর্ট ঐ সব যুক্তরাষ্ট্রীয় বিরোধের মীমাংসা করে।

(২) আপীল এলাকা ঃ সুপ্রীম কোর্ট ভারতের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। এই আদালতের আপীল এলাকাকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়—

(ক) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপীল ঃ কোন মামলা সম্পর্কে হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেন যে, সংশ্লিষ্ট মামলার সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহলে সেই মামলার বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। হাইকোর্ট সার্টিফিকেট না দিলেও সুপ্রীম কোর্ট নিজেই আপীল করার বিশেষ অনুমতি দিতে পারেন।

(খ) দেওয়ানি আপীল ঃ কোন দেওয়ানি মামলায় হাইকোর্ট যদি এই মর্মে প্রমাণপত্র দেন যে সংশ্লিষ্ট মামলাটির সঙ্গে আইনের প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে তা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। সংবিধানের ৩০-তম সংশোধন (১৯৭২) এর আগে দেওয়ানি মামলায় সুপ্রীম কোর্টের আপীলের ক্ষেত্রে মামলাটির ক্ষেত্রে অন্তত ৩০ হাজার টাকা মূল্যের প্রশ্ন জড়িত থাকা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, কোন দেওয়ানি মামলার বিচার সুপ্রীম কোর্টে হওয়া উচিত বলে হাইকোর্ট মনে করলে সেই মামলা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়।

(গ) ফৌজদারি আপীল ঃ সংবিধানের ১৩৪ নং ধারা অনুসারে ফৌজদারি মামলার ব্যাপারে তিনটি ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়, ডিগ্রি বা চূড়ান্ত আদেশ এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়—(ক) নিম্নতম আদালতের বিচারে নির্দোষ বলে ঘোষিত কোন ব্যক্তিকে যদি হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন; কিংবা (খ) নিম্ন আদালতে বিচারচলাকালীন কোন মামলা নিজের হাতে তুলে নিয়ে হাইকোর্ট যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন, অথবা (গ) হাইকোর্ট কোন মামলাকে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীলযোগ্য বলে যদি সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

(ঘ) ভারতের যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের যে কোন রায়, আদেশ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করার বিশেষ অনুমতি সুপ্রীম কোর্ট প্রদান করতে পারেন।

(৩) পরামর্শদান এলাকা ঃ সংবিধানের ১৪৩ নং ধারা অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শমূলক এক্তিয়ার

আছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইনসংক্রান্ত প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শদান সংক্রান্ত ক্ষমতাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—(ক) রাষ্ট্রপতি মনে করলে আইনের যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মতামতের জন্য সুপ্রীম কোর্টে তিনি তা পাঠাতে পারেন; (খ) প্রচলিত যে সমস্ত সন্ধি, চুক্তি, সদস্য যা সংবিধান চালু হওয়ার আগে সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

(৪) **নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারি করার ক্ষমতা ঃ** সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৩২ নং ধারা অনুসারে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ ইত্যাদি লেখ, নির্দেশ বা আদেশ (Writ) জারি করতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের এই সমস্ত এলাকা, এক্তিয়ার ও ক্ষমতা ছাড়াও আরও কতকগুলি ক্ষমতা আছে, যেমন—সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় দেওয়া যে কোন রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে। যেমন—সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারবে বলে সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল শঙ্করী প্রসাদ (১৯৫১) ও সজ্জন সিং (১৯৬৫)-এর মামলায়, সে রায় সুপ্রীম কোর্ট গোলকনাথ মামলায় (১৯৬৭) পুনর্বিবেচনা করে রায় দেয় যে ভবিষ্যতে সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারবে না। আবার কেশবানন্দ ভারতী মামলায় (১৯৭৩) সুপ্রীম কোর্ট এই রায় পুনর্বিবেচনা করে রায় দেয় যে সংসদের হাতে মৌলিক সংশোধনের ক্ষমতা রয়েছে। তবে সে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ সংশোধনের মাধ্যমে সংসদ সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন করতে পারবে না।

এ ছাড়া আদালতের অবমাননার জন্য সুপ্রীম কোর্ট অবমাননাকারীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা

বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা (Judicial Review) বলতে আদালতের এমন এক ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা আদালত আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোন আদেশ বা নির্দেশ সংবিধানবিরোধী এই কারণে বাতিল করে দিতে পারে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টেরও এই ক্ষমতা আছে। সুপ্রীম কোর্টই সংবিধানের অভিভাবক ও চরম ব্যাখ্যাকর্তা। সংবিধানের ব্যাখ্যা, আইন ও আদেশের বৈধতা বিচার, কেন্দ্র রাজ্যের বিরোধমীমাংসা এবং নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট তার বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বিশেষ করে ৪২ তম সংশোধন (১৯৭৬) এর মাধ্যমে সংসদ সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা বজায় রাখতে পেরেছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার-বিভাগ বাস্তবে আইনের অনুশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করে। আইনের কর্তৃত্ব সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে কেহ যতই উচ্চপদে আসীন হোন না কেন, তিনি প্রচলিত আইন আদালতের অধীন। আইন লঙ্ঘনজনিত শাস্তিকে কেউই অগ্রাহ্য করতে পারে না। আদালতের এই ভূমিকার

কারণে অসৎ উপায়ে অর্থ আত্মসাৎ ও অন্যান্য দুর্নীতির অনেক ঘটনাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বিচারপতি ভার্মা (J. S. Varma) এ বিষয়ে বলেছেন ঃ "Be you ever so high, but the law is above you."

বিচার বিভাগ দেশের সংবিধান তথা সমগ্র সাংবিধানিক ব্যবস্থার অভিভাবক। দেশের আইনকানুনের মৌলিক কাঠামো সংরক্ষণের বিষয়ে আদালতের উপর বিশেষ দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করা আছে। দেশের মৌলিক আইনব্যবস্থাকে আঘাত করলে বা বিপন্ন করে তোলার উদ্যোগ দেখা দিলে, তা প্রতিহত করার জন্য নিপীড়িত মানুষের কাছে ন্যায়বিচারকে পৌঁছে দেওয়া জন্য বিচার বিভাগকে সদা জাগ্রত থাকতে হয়। এই ধারণার ভিত্তিতেই বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার সৃষ্টি হয়েছে। বিচারপতি সাওয়ান্ত (P. B. Sawant) তাঁর Judicial Activism : Trends and Prospects শীর্ষক রচনায় বলেছেন ঃ "(Judicial Activism) may be defined on the action of the judiciary which tends to increase on legislative and executive fields."

সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর অনেক দেশেই আইনসভার দৌরাত্ম দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা এবং আমলারা স্বৈরাচারী কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করছেন। এ সবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে উচ্চতর আদালত হস্তক্ষেপ করছে। ভারতে পরিস্থিতির প্রয়োজনের চাপেই বিচার-বিভাগীয় সক্রিয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮৫ সালে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি পি. এন. ভগবতীকে লেখা এক ক্ষুব্ধ নাগরিকের পোস্টকার্ড জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার আবেদনপত্র হিসাবে গণ্য করেন। এর থেকেই ভারতে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার সূত্রপাত ঘটে। কালক্রমে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলায় সুপ্রিমকোর্ট বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সুপ্রিমকোর্ট বিভিন্ন বিষয়ে সংবেদনশীল ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সমস্ত বিষয়গুলি হল ঃ সরকারি ও বিরোধীপক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ-জড়িত 'হাওয়ালা' কেলেঙ্কারী মামলায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালন, ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মারক সমূহের সংরক্ষণ, সরকারি আবাসনে অবৈধ দখলদারীর অবসান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, মহানগরীগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করা ও রাখা, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি তৈরি ইত্যাদি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেছে। ১৯৮৩ সালে সুপ্রিমকোর্ট বেগার শ্রমিকদের মুক্তিদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও হরিয়ানা সরকারকে নির্দেশ দেয়, আবার ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত একটি নির্দেশে সুপ্রিমকোর্ট বলে যে এক গাড়ি পাথর ভাঙ্গার জন্য কমপক্ষে একাত্তর টাকা (৭১) মজুরী দিতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনমূলক বিধি-ব্যবস্থা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শাহবানু মামলা (১৯৮৫) এবং সুবানু মামলায় (১৯৮৭) প্রদত্ত সুপ্রিমকোর্টের সাহসী ও প্রগতিশীল রায়ের কথা বলা যায়। ২০০২ সালে সুপ্রিমকোর্ট নির্বাচনী সংস্কার প্রসঙ্গে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী রায় দেন। তাতে বলা হয় যে, নির্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র পেশ করার সময়ে হলফনামার মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্র, বিষয়সম্পত্তির হিসাবপত্র, দুর্নীতি বা অপরাধ সম্পর্কিত মামলায় অভিযুক্ত থাকা বা না থাকার স্বীকারোক্তি ইত্যাদি।

জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলায় (PIL-Public Interest Litigation) বিচার কার্য সম্পাদনে বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তার অভিব্যক্তি ঘটেছে। অনেকে অভিযোগ করেন যে অতিসক্রিয়তার মাধ্যমে বিচার বিভাগ আইন

বিভাগ, শাসন বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের অভিযোগ অসঙ্গত প্রতিপন্ন হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে, সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও সাংবিধানিক বিরোধ সহ বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসা করে; সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোন আদেশ-নির্দেশ সংবিধানসম্মত না হলে সেটিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট মৌলিক অধিকারের বিরোধী সমস্ত আইনকে বাতিল করে দিয়ে নাগরিক-অধিকার সুনিশ্চিত করে।

০৮.৬ হাইকোর্ট

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে হাইকোর্ট থাকবে। অবশ্য সংসদ আইন প্রণয়ন করে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট স্থাপন করতে পারে।

(১) গঠন ঃ একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য কয়েকজন বিচারপতিকে নিয়ে হাইকোর্ট গঠিত হবে। অন্যান্য বিচারপতির সংখ্যা কত হবে তা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করবেন।

(২) নিয়োগ ঃ হাইকোর্টের বিচারপতিরগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তাঁকে পরামর্শ করতে হয়। অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁকে এ ছাড়াও সেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়।

(৩) কার্যকাল ও অপসারণ ঃ হাইকোর্টের একজন বিচারক ৬২ বছর পর্যন্ত পদে আসীন থাকতে পারেন। তবে বিভিন্ন কারণে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির পদ খালি হতে পারে—(ক) পদত্যাগ, (খ) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্তি অথবা বদলি অথবা (গ) অসাধারণ কিংবা অসামর্থ্য-র অভিযোগ সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্যের অধিকাংশ ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অপসারণ।

(৪) বেতন ভাতা ইত্যাদি ঃ হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতি মাসিক ৯০০০ এবং অন্যান্য বিচারপতি মাসিক ৮০০০ টাকা বেতন পান। বিচারপতিদের বেতন-ভাতা আর্থিক জরুরী অবস্থা ছাড়া অন্য সময়ে হ্রাস করা যায় না।

(৫) যোগ্যতা ঃ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যোগ্যতাবলীর প্রয়োজন তা হল—

(ক) ভারতীয় নাগরিকত্ব; এবং

(খ) ভারতে যে কোন বিচারবিভাগীয় পদে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা (গ) হাইকোর্টে ১০ বছরের এ্যাডভোকেট হিসাবে অভিজ্ঞতা।

(৬) বিচারকদের স্বাধীনতা ঃ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের মত হাইকোর্টের বিচারকদেরও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সংবিধান কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) কেবলমাত্র প্রমাণিত অসদাচরণ ও অক্ষমতার কারণে সংসদের উভয় কক্ষে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদিত ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের পর রাষ্ট্রপতি একজন হাইকোর্টের বিচারককে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করতে পারেন।

(খ) হাইকোর্টের বিচারকদের বেতন ও ভাতা বাবদ যে ব্যয় হবে তা রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে নির্বাহ করা হত।

(গ) বিচারকদের বেতন ও ভাতা আর্থিক জরুরী অবস্থা ছাড়া হ্রাস করা যায় না।

(৭) হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে—

(ক) মূল এলাকা ঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় হাইকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ৪২তম সংবিধান সংশোধন (১৯৭৬) এই ক্ষমতা হাইকোর্টের হাত থেকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনালের হাতে দিলেও ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) আবার তা হাইকোর্টের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে।

(খ) আপীল এলাকা ঃ হাইকোর্ট রাজ্যের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

(গ) নির্দেশ, আদেশ লেখ জারির ক্ষমতা ঃ হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ, আদেশ বা লেখ (Writ) জারি করতে পারে (২২৬ নং ধারা)। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ছাড়াও অন্য যে-কোন উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট ঐসব নির্দেশ জারি করতে পারে। কিন্তু এই ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে অর্পিত হয় নি।

(ঘ) আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা ঃ হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে। ৪২ তম সংশোধন আইনে কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতার উপর যে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, ৪৩ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তা অপসারণ করা হয়েছে।

(ঙ) তত্ত্বাবধানমূলক ক্ষমতা ঃ প্রত্যেক হাইকোর্ট তার এক্তিয়ারভুক্ত গোটা এলাকার সমস্ত আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা আছে। তবে কোন সামরিক ট্রাইব্যুনালের উপর হাইকোর্টের এই ক্ষমতা নেই।

এই কোর্ট অধস্তন আদালতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঐ সমস্ত আদালতগুলির বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়ম-কানুন রচনা করতে পারে।

এ সব কার্যাবলী ছাড়াও হাইকোর্টকে অভিলেখ আদালত (Court of Record) হিসাবে কাজ করতে হয়, এবং নিজের অবমাননার জন্য অবমাননাকারীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

০৮.৭ অধস্তন আদালতসমূহ

হাইকোর্টের নিম্নে বিচারকার্য সম্পাদনের দায়িত্ব অধস্তন আদালত-সমূহের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এই অধস্তন আদালতগুলির গঠন ও নাম রাজ্যভেদে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

অধস্তন বিচার ব্যবস্থার কাঠামোগত দিক থেকে সর্বনিম্নে অবস্থিত ন্যায়-পঞ্চায়েত। ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারপতিগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ বা মিউনিসিপ্যালিটির কোন সদস্য ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারপতি পদে প্রার্থী হতে পারেন। ন্যায় পঞ্চায়েতের উপর গ্রামের ছোট খাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে।

ন্যায় পঞ্চায়েতের ঊর্ধ্বতন দেওয়ানি আদালত হল মুন্সেফ আদালত। মহকুমা ও জেলা শহরে এরূপ আদালতের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মুন্সেফ আদালতের উপর আছে সাব-জজের আদালত। মুন্সেফ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সাব-জজের আদালতে আপীল করা যায়। আদালতের মূল এলাকা ও আপীল এলাকা আছে। অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যের টাকার দাবি-সমন্বিত মামলা মূল এলাকায় হয়।

সাব-জজের ওপরে রয়েছে জেলা জজের আদালত। জেলার সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হলেন জেলা জজ। সাধারণত প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা জজের আদালত থাকে। এই আদালতের মূল এলাকা এ আপীল এলাকা রয়েছে।

বড় বড় শহরে ছোট খাটো মামলা বিচারের জন্য ছোট আদালত (Small Causes Courts) আছে। এ ছাড়া কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশেষ ধরনের মামলার বিচারের জন্য নগর দেওয়ানি আদালত (City Civil Courts) গঠন করা হয়েছে।

জেলা শহরে ফৌজদারি মামলার জন্য সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হলেন দায়রা জজ। জেলা জজই দায়রা জজ হিসাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। জেলার আয়তন অনুসারে একাধিক দায়রা জজও থাকতে পারেন।

কলিকাতার মত মেট্রোপলিটান শহরে ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য আছেন মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট। দায়রা জজ ও মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে একমাত্র হাইকোর্টেই আপীল করা যায়। সংবিধানের ২৩৩ নং ধারা অনুসারে হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যপাল জেলা জজ, দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করেন।

সুতরাং ভারতের ক্রমস্তর-বিন্যস্ত অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত সুপ্রিম কোর্ট এবং সর্বনিম্নে ন্যায় পঞ্চায়েত।

০৮.৮ সারাংশ

ভারতের বিচার-ব্যবস্থার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং বিচারপতিদের নিয়োগ, যোগ্যতা কার্যকাল, বেতন-ভাতা ও স্বাধীনতা বজায় রাখার উপায়সমূহ সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত আছে।

ভারতের ক্রমস্তর, পিরামিড-সদৃশ অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রীম কোর্ট, তারপর হাইকোর্ট এবং হাইকোর্টের নীচে অধস্তন আদালত আছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংবিধানিক ভারসাম্য বজায় রাখে, সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি এবং মূল এলাকার সাংবিধানিক বিরোধসহ বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসা করে। সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট তার বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সংসদ-প্রণীত আইন ও শাসন বিভাগের আদেশ-নির্দেশ সংবিধানে সম্মত না হলে তা বাতিল করে দিয়ে সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করে। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকারের বিরোধী সমস্ত আইন বাতিল করে দিয়ে নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করে।

জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলার (PIL – Public Interest Litigation) বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তার অভিব্যক্তি ঘটেছে। অনেকে অভিযোগ করেন যে অতিসক্রিয়তার ফলে বিচারবিভাগ আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করছে। তবে অনেকক্ষেত্রেই এ ধরনের অভিযোগ অসঙ্গত প্রতিপন্ন হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের নীচে সাধারণত প্রতিটি রাজ্যে একটি করে হাইকোর্ট আছে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট রাজ্যের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় হাইকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্গত। তাছাড়া, হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের মত মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন লেখ বা রিট (Writ) জারি করে, আইনের বৈধতা বিচার করে এবং অধস্তন আদালতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজ্যের গভর্নর হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করেই অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করেন।

অধস্তন আদালতগুলির শীর্ষে রয়েছে দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে জেলা জজের আদালত, আর ফৌজদারি মামলার জন্য দায়রা জজের আদালত। মেট্রোপলিটান শহরগুলিতে ফৌজদারি মামলার জন্য রয়েছে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট। জেলা জজ, দায়রা জজ ও মেট্রোপলিটান জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করতে হয়।

জেলা স্তরের নীচে সাব-জজের আদালত, মুন্সেফের আদালত এবং অধস্তন বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্নে রয়েছে ন্যায় পঞ্চায়েত।

সুতরাং ভারতের ক্রমস্তর বিন্যস্ত অখণ্ড বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্ট এবং সর্বনিম্নে ন্যায় পঞ্চায়েত।

০৮.৯ অনুশীলনী

(১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের কে এবং কিভাবে নিযুক্ত করে?

(২) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাবলী কি?

(৩) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কিভাবে অপসারিত হন?

(৪) সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শদান এলাকা ব্যাখ্যা করুন?

(৫) বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা বলতে কি বোঝায়?

(৬) হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন?

(৭) অধস্তন আদালতের গঠন বিবৃত করুন?

(৮) বিচার বিভাগের অতি সক্রিয়তা সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

০৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Granville Austin; *The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation,* Oxford University Press, London, 1977.

(2) Upendra Baxi; *The Indian Supreme Court and Politics,* Eastern Book Co., Lucknow.

(3) দুর্গাদাস বসু ; *ভারতের সংবিধান পরিচয়,* (অনুবাদ) প্রেন্টিস হল, নিউ দিল্লী, ১৯৯৪

(4) নিমাই প্রামাণিক; *ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা,* ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা।

(5) অনাদি কুমার মহাপাত্র; *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি,* সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।

একক ০৯ ☐ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঃ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

গঠন

০৯.১ উদ্দেশ্য

০৯.২ প্রস্তাবনা

০৯.৩ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

০৯.৪ ভারতীয় শাসনকাঠামোর বৈশিষ্ট্য

০৯.৫ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন
মূল্যায়ন

০৯.৬ শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন

০৯.৭ আর্থিক ক্ষমতার বণ্টন

০৯.৮ পরিকল্পনা কমিশন

০৯.৯ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি

০৯.১০ সারাংশ

০৯.১১ অনুশীলনী

০৯.১২ গ্রন্থপঞ্জী

০৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- ভারতীয় সংবিধান ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে নির্মাণ করেছে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনক্ষমতার যে সুস্পষ্ট বিভাজন করা হয়েছে তার প্রকৃতি বুঝতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্র না এককেন্দ্রিক, কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা ভারতের সংবিধান গ্রহণ করেছে, সেই প্রশ্নের সমাধান সূত্র পাবেন।
- কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধুনা যে সব চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, সে সম্পর্কেও কিছুটা অবহিত হবেন।

০৯.২ প্রস্তাবনা

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতে যে নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়, সেখানে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতকে একটি রাজ্যসংঘ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকগুলি অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত এই রাজ্যসংঘ পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বৈশিষ্ট্য বহন করলেও, সংবিধানে অত্যন্ত সচেতনভাবেই 'যুক্তরাষ্ট্রে' শব্দটি পরিহার করা হয়েছে। তাই নানান সময়ে অসতর্কভাবে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে অনেকে বর্ণনা করলেও সর্ব অর্থে ভারতকে একটি পরিপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র বলা হয় না।

ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো বিচার করলে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল ঃ (ক) কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুই ধরনের সরকারের অবস্থিতি (খ) লিখিত ও অংশত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (গ) কেন্দ্র ও রাজ্য, এই দুই ধরনের সরকারের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টিত ক্ষমতা (ঘ) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত।

কিন্তু এইসব বৈশিষ্ট্যের সুবাদে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করার কিছু বাধাও আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আইন প্রণয়ন, প্রশাসন এবং আর্থিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের গুরুত্ব এবং প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেমন, দ্বিবিধ সংবিধান ও দ্বিবিধ নাগরিকতার অনুপস্থিতি, সংসদের উচ্চকক্ষে সমপ্রতিনিধিত্বের অভাব ইত্যাদির কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এককেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই সংবিধান বিশেষজ্ঞ অস্টিন মন্তব্য করেছেন যে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর প্রকৃতি এতোই বিচিত্র যে তার কোনও নির্দিষ্ট চরিত্রায়ন সম্ভব নয়।

অস্টিনের এই মন্তব্যটিকে সামনে রেখে ভারতের সংবিধান ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোটি নির্মাণ করেছে, সে সম্পর্কে বিচার করার চেষ্টা করব।

০৯.৩ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকাঠামো অনুসরণ করে ভারতীয় সংবিধান ভারতে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার অনেকাংশে মিল থাকলেও কিছু কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভিন্নতার সূত্র ধরে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপ বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে, সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্র বলতে আমরা কী বুঝি।

সাধারণভাবে যেকোন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, যে কোনও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই ধরনের সরকার থাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকার। এই দুই সরকারের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় যে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকার একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। একদিকে জাতীয় প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য ইত্যাদি কারণে একটি কেন্দ্র অভিমুখী শক্তির জন্ম দেয় যার ফলে একটি সাধারণ জাতীয় সরকারের [illegible] হয়। অন্যদিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত ইত্যাদি নানান পার্থক্য থাকবার জন্য আঞ্চলিকভাবে সরকার প্রতিষ্ঠার মনোভাব কাজ করে। এই ধরনের মনোভাব কেন্দ্রাতিগ শক্তির জন্ম দেয়। এই শক্তিই

আঞ্চলিক সরকারকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে। এইভাবে এই দুধরনের সরকার পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

দ্বিতীয়ত, দ্বিবিধ সরকার থাকায়, এই দুই স্তরের সরকারের কাজকর্মকে সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। অন্যথায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। সেই কারণে জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন প্রতিরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয়। অপরপক্ষে শিক্ষা, কৃষি, জলসেচ ইত্যাদি আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইভাবে একই সঙ্গে, দুটি স্তরে দুটি সরকার আপন আপন ক্ষমতার প্রয়োগ করে।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে যাতে কোনভাবেই কোনও স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত না নিতে পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সব সময়ই সংবিধান প্রাধান্য পায়।

চতুর্থত, সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানকে লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলা হয়। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় না হলে উভয় সরকারই স্বীয় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করতে পারে এবং শাসনকার্যকে জটিল করে তুলতে পারে। তাই সংশোধন পদ্ধতিটিকে জটিল করে সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলা হয়। ফলে এককভাবে কোন সরকার সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংবিধানের সংশোধন করতে পারে না।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র রাজ্য বিরোধ মেটাতে এবং সংবিধানের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রয়োজন হয়। বস্তুত, নিরপেক্ষতা না থাকলে কোনও আদালত বিরোধের যথাযথ মীমাংসা করতে পারে না। সেইদিক থেকে এই আদালতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয়, আইনসভার দুটি কক্ষ এবং দ্বিনাগরিকত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম দুটি শর্ত। দ্বিনাগরিকত্বের ক্ষেত্রে একজন নাগরিক একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং অঙ্গরাজ্য উভয়েরই নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঙ্গরাজ্যগুলি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে ইচ্ছামতো যোগ দিতে এবং বিচ্ছিন্ন হতে পারে, সেই কারণে এই দ্বিনাগরিকত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়। অপরদিকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে আইনসভার উচ্চকক্ষে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিরা থাকেন। তাই আইনসভার উচ্চকক্ষে আঞ্চলিক সমস্যার যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে। অপরপক্ষে, জনগণের প্রতিনিধিরা সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে নিম্নকক্ষে যোগদান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে আইনসভার উচ্চকক্ষে প্রতিটি আঞ্চলিক রাজ্য থেকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠানোর কথাও বলা হয় যাতে প্রতিটি রাজ্যই আইনসভায় সমান গুরুত্ব পায়। তবে এই দুটি বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আবশ্যিক শর্ত বলে অনেকে মনে করেন না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এই সব বৈশিষ্ট্যকে মনে রেখে ভারতের শাসনকাঠামোকে যদি বিচার করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব, ভারতকে প্রচলিত অর্থে যুক্তরাষ্ট্র কেন বলা হয় না।

০৯.৪ ভারতীয় শাসনকাঠামোর বৈশিষ্ট্য

কোনও রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা কীভাবে বণ্টিত হবে তা নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি, রাজনৈতিক আদর্শ, ভূখণ্ডের আয়তন, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদি নানান কারনের উপর। ভারতের সংবিধান যখন রচনা করা হয়, সংবিধান প্রণেতারা স্বভাবত এই বিষয়গুলিকে বিবেচনার মধ্যে এনেছিলেন। এর ফলে ভারতে যে শাসনকাঠামো নির্মাণ করা হয় তা আকারগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সব রীতিই এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই সংবিধানের ১নং ধারায় ভারতকে একটি রাজ্যসংঘ বলা হয়েছে। এই সংঘের অন্তর্ভুক্তি যেমন অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের মতো স্বেচ্ছাধীন নয় তেমনি প্রয়োজনবোধে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারও তাদের দেওয়া হয়নি। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুই স্তরে শাসনক্ষমতা বণ্টন করা হলেও ভারতে কোনওক্রমেই একটি যুক্তরাষ্ট্র বলে মনে করা যাবে না।

তবে ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসারে গড়ে তোলার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, ভারত একটি বিশাল ও জনবহুল রাষ্ট্র। এই বিশাল ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ভিতরেও নানান ধরনের ঐতিহ্য বয়ে চলেছে। সংবিধান প্রণেতারা মনে করেছিলেন, কোনও এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে এতো ব্যাপক সমাধান করা সহজ হবে না। যেহেতু আঞ্চলিক সমস্যাগুলি স্বতন্ত্র এবং জটিল, যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে এই সংস্কৃতি চেতনার স্ফুরণ সম্ভব হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল। আমরা জানি, প্রাকস্বাধীনতা পর্বে ভারতে দু'ধরনের রাজ্য ছিল : (ক) ইংরেজ-শাসিত ভারত অর্থাৎ ভারতের যে অংশটি প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনের অধীন ছিল এবং (খ) দেশীয় রাজ্যসমূহ অর্থাৎ দেশীয় রাজা-নবাব শাসিত রাজ্য যেগুলি আবার ইংরেজ সরকারের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয়ত, ঐ একই আইনের প্রবর্তনার ফলে অনেক প্রাদেশিক রাজনীতিবিদ প্রাদেশিক রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন, যাঁরা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এঁরা সকলেই স্বাগত জানান কারণ এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁরাও সকলে আঞ্চলিক রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করেন।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো হলেও সংবিধানের বিভিন্ন ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়নি। একথা সত্য যে ভারতের শাসনকাঠামোয় যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে। যেমন, প্রথমত, ভারতে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক এই দুই স্তরে সরকার বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় সবসময়ই ভারতীয় সংবিধান প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তৃতীয়ত, এই সংবিধান লিখিত

এবং সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি যেহেতু জটিল, তাই সংবিধানকে আপাতভাবে সুপরিবর্তনীয় বলা যায় না। চতুর্থত, সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে। এর ফলে উভয় সরকারে শাসন করার এক্তিয়ার সুস্পষ্ট এবং সাদাকালো অক্ষরে লেখা রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে সেই কলহের মীমাংসা করার জন্য স্বাধীন ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সুপ্রীম কোর্ট রয়েছে। প্রয়োজনবোধে ভারতের রাষ্ট্রপতিও সংবিধানের কোনো আইনের ব্যাখ্যার জন্য সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন সরকারের কার্যাবলীর সাংবিধানিকতা যাচাই করতে পারে। কোনো আইনের বৈধতাও বিচার করতে পারে। কিন্তু সেই আইন অযৌক্তিক কিংবা ক্ষতিকারক কিনা সেই প্রশ্নে যেতে পারে না।

ভারতের শাসনব্যবস্থার এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে অনেকেই মনে করেছেন প্রকৃতিগতভাবে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু আরও একটু সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারব যে ভারতের সংবিধান ভারতকে আক্ষরিক অর্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় করে গড়ে তুলতে চায়নি। বস্তুত, অনেকক্ষেত্রেই ভারতীয় সংবিধান তার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরে থেকেও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বহু বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটিয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের ক্ষমতাবণ্টনের ক্ষেত্রে যে সকল নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সকল সময়ই কেন্দ্রকে অঙ্গরাজ্যগুলির তুলনায় অধিক শক্তিশালী করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কীভাবে সংবিধানে কেন্দ্রীভবনের স্বপক্ষে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। এর ফলে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীভবনের যে ঝোঁক দেখা যায়, তার ব্যাপকতা বিচার করে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা অনেকেই ভারতকে আধাযুক্তরাষ্ট্রীয় বা সমজাতীয় বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। তবে যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন, ভারতের শাসনব্যবস্থা যে কোনও বিশেষ যুক্তরাষ্ট্র বা এককেন্দ্রিক সরকারকে অনুকরণ করে গড়ে তোলা হয়নি। বরং উভয় প্রকার ব্যবস্থার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, একথাই স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। এই সমন্বয় ঘটানোর ফলে ভারত একটি নতুন রকমের রাজ্যসংঘ হয়ে উঠেছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

০৯.৫ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন

ভারতীয় সংবিধানের ২৪৬(১) ধারায় সংসদকে সমগ্র রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের যে কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সংসদে গৃহীত যে কোন আইন সকল অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা ঐ আইনে নির্দেশিত বিশেষ কোনও অঞ্চলের প্রতি প্রয়োগ করা যাবে। এছাড়া ২৪৫(২) ধারা অনুসারে সংসদীয় আইন ভারতীয় নাগরিক, প্রজা এবং ভারতের বাইরে অবস্থিত কোনও সম্পত্তির উপরও প্রযুক্ত হবে।

তবে সংসদের অধীনস্থ অধিকার ক্ষেত্র সম্পর্কে কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন আন্দামান এবং লাক্ষাদ্বীপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কোন সংসদীয় আইনকে বাতিল বা সংশোধন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সংসদীয় আইন তফশীল অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানের প্রতি প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তৃতীয়ত, অসমসহ কয়েকটি রাজ্যের রাজ্যপাল বিশেষ নোটিস বলে কোনও বিশেষ সংসদীয় আইন কোনও স্বায়ত্তশাসিত জেলা বা অঞ্চলের প্রতি প্রযোজ্য হবে না সেকথা ঘোষণা করতে পারেন।

এছাড়া ২৪৫ (১) ধারা অনুসারে, কোন অঙ্গরাজ্যের আইনসভা সেই রাজ্য বা তার কোন বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু সেই আইন কোনক্রমেই অন্য অঙ্গরাজ্যের প্রতি প্রযোজ্য হবে না। ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফশীলে তিনটি তালিকা সংযোজিত করে কেন্দ্র এবং রাজ্য এই দুই স্তরে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে। উল্লেখিত তালিকা তিনটি হল : (ক) কেন্দ্র তালিকা (খ) রাজ্য তালিকা ও (গ) যুগ্ম তালিকা। তালিকার নামকরণ থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে তালিকাগুলি কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে। মূলত জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিই তালিকার অন্তর্গত। বিভিন্ন সময়ে নানান রকম সংশোধনের ফলে বর্তমানে এই কেন্দ্র তালিকার বিষয়সংখ্যা হল ৯৯টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়াবলি, যুদ্ধ ও শান্তি, পারমাণবিক শক্তি, বীমা, ডাক ও তার ইত্যাদি। সংসদ কেবল এই বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করার অধিকারী। এ ছাড়া মূলত আঞ্চলিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্য তালিকা গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, আরক্ষা বাহিনী, জনস্বাস্থ্য, জল সরবরাহ রাস্তাঘাট, কৃষি ইত্যাদি। বর্তমান রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়সংখ্যা হল ৬১। রাজ্য আইনসভা এইসব বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে।

যুগ্মতালিকার অন্তর্গত বিষয়সংখ্যা বর্তমানে ৫২। এই বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে যদি দেখা যায় কোনও একটি বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় আইন ও রাজ্য আইনের মধ্যে বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ হবে এবং কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী রাজ্য আইন বাতিল বলে গণ্য করা হবে। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, সংবাদপত্র, শ্রমিক কল্যাণ, বিদ্যুৎ, বন্যপ্রাণী ও পাখি সংরক্ষণ, ওজন ও পরিমাপ, ক্রীড়া, শিক্ষা ইত্যাদি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আলোচিত এই তিনটি তালিকার বাইরে এমন যদি কোনও বিষয় থাকে যে কোন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, সেইসব অনুল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই বিষয়গুলিকে বলা হয় অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residual Power) এবং সংবিধানের ২৪৮ ধারা অনুসারে এই ক্ষমতাপুঞ্জ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত। সংবিধান নির্দেশিত এই তালিকা তিনটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটানো হয়েছে।

এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন সংবিধানের অন্যান্য কয়েকটি ধারা অনুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সংবিধানের ২৪৯-২৫৩ ধারায় এই বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪৯ ধারা অনুসারে, রাজ্যসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের, ২/৩ অংশ যদি এমন প্রস্তাব

গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনও বিষয় নিয়ে সংসদে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তাহলে সেই বিষয়ে সংসদ আইন নির্মাণ করতে পারে।

২৫০ ধারা অনুসারে, জরুরী অবস্থার সময় সংসদ রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

২৫১ ও ২৫৫ ধারা অনুসারে যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে কেন্দ্র রাজ্য বিরোধে কেন্দ্রীয় আইন, বলবৎ হবে।

২৫২ ধারা অনুসারে দুই বা ততোধিক রাজ্যের অনুরোধক্রমে সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

এছাড়া ২৫৩ ধারা বলে সংসদ রাজ্য তালিকার বিষয় সম্পর্কে আইন তৈরি করতে পারে যদি কোনও আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তির বিষয় হয়ে থাকে।

সংবিধানে উল্লিখিত এইসব আইন যেমন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য অপেক্ষা কেন্দ্রকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তেমনি সংবিধানের আরও কিছু ধারা কেন্দ্রীভবনের বিষয়টিকে সমর্থন করে।

যেমন ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা (Constitutional breakdown) ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের হাতে অর্পণ করতে পারেন।

এছাড়া রাজ্যপালের হাতেও এমন কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে পরোক্ষভাবে কেন্দ্র রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন, রাজ্য আইনসভায় প্রস্তাবিত কোন বিল রাজ্যপালের কাছে সম্মতির জন্য পাঠানো হলে, রাজ্যপাল সেই বিলে সম্মতি ও অসম্মতি কোনও কিছু না জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিও সেই বিলকে ইচ্ছেমতো তাঁর মতামত না দিয়ে আটকে রাখতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যেহেতু আবার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই কাজ করেন, সুতরাং এইভাবে কার্যত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রণীত কোনও আইন বলবৎ করা না করার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

এছাড়া সংবিধানের ২৮৮(১) ও (২) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে আন্তঃরাজ্য নদী অথবা নদীউপত্যকা নিয়ন্ত্রণ সূত্রে কোনও আইন রাষ্ট্রপতির আদেশ ছাড়া বলবৎ হতে পারবে না।

আবার ৩০৪ ধারা অনুসারে, আন্তঃরাজ্য ব্যবসাবাণিজ্যের উপর কর ধার্য করার এক্তিয়ার রাজ্যের হাতে থাকলেও তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষ।

কেন্দ্রীভবনের এইসব উদাহরণ সামনে রেখে বিভিন্ন সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এ সম্পর্কে জনমত গড়ে উঠেছে। অনেকে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস চেয়েছেন। আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে বোঝবার চেষ্টা করব যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বাইরেও নানান ক্ষেত্রে রাজ্যের উপর কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটাতে সাহায্য করে।

মূল্যায়ন

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক এবং আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টনের নীতি যে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সমর্থক নয়, তা আমরা সংবিধান পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারি। যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের এক্তিয়ার সুনির্দিষ্ট এবং স্বাধিকার রক্ষিত হয়, এখানে তা দেখা যায় না। বরং সর্বত্র কেন্দ্রেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই কেন্দ্রের অধীন এবং সময়সাপেক্ষে রাজ্যের বিষয়গুলিও কেন্দ্রের অধীনে চলে যাতে পারে। এছাড়া সংবিধানের ২০০ ধারা অনুযায়ী যে কোন রাজ্য আইন সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতিকে সেই বিলে স্বাক্ষর না করার জন্য প্রভাবিত করতে পারে। অবশিষ্ট ক্ষমতাও যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় সংবিধান সেক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতেই রেখেছে। সমালোচকরা বিভিন্ন সময় সংবিধানের ক্ষমতা বণ্টনের এই নীতিকে অযুক্তরাষ্ট্রীয় বলে যেভাবে দোষারোপ করেছেন তা ঠিক নয়। কারণ মনে রাখতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হলেও সংবিধানের ১নং ধারা থেকে শুরু করে কোথাও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়নি। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত ভারতীয় শাসনব্যবস্থা, এই ধরনের অভিযোগই ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংবিধান প্রণেতারা আপাত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রেখে যে ভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়তে চেয়েছিলেন সেটা খেয়াল রাখা দরকার। আইনপ্রণয়ন ছাড়া শাসনক্ষমতা ও আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলেও আমরা দেখতে পাব যে একই আদর্শের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আধিপত্য অঙ্গরাজ্যগুলির উপর বিস্তৃত হয়েছে।

০৯.৬ শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন

আইনসংক্রান্ত বিষয়ে যেমন লক্ষ্য করা গেছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে এক ধরনের ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটানো হয়েছে, সঙ্গতভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রেও এই কেন্দ্রীভবনের ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির এক্তিয়ার সুনির্দিষ্ট করার সময় প্রশাসনিক সম্পর্কের বিষয়টিকেও বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। সংবিধানের ৭৩নং ধারায় প্রশাসনিক এক্তিয়ার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ধারা অনুসারে যেসব বিষয় পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং সন্ধি ও চুক্তির ব্যাপারে ভারত সরকার যেসব ক্ষমতা বা অধিকার ভোগ করে, সেইসব বিষয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতার এক্তিয়ার প্রসারিত। অপরপক্ষে রাজ্য তালিকাভুক্ত যেসব বিষয়ে রাজ্য-আইনসভা আইন প্রণয়ন করার অধিকারী, সেইসব বিষয় ১৬২ নং ধারা অনুসারে রাজ্যগুলির হাতে থাকবে। এছাড়া সংবিধানের ২৫৬-২৬৩ নং ধারা, ২৫৩, ৩৩৯, ৩৫০, ৩৫১ ও ৩৬৫ নং ধারায়ও কেন্দ্ররাজ্যের প্রশাসনিক সম্পর্কের কিছু কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে, সপ্তম তফশীলে বর্ণিত তিনটি তালিকায় যেভাবে আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার বণ্টন করা হয়েছে, ৭৩ ও ১৬২ ধারায় বলা হয়েছে যে প্রশাসনের ক্ষেত্রেও ঐ তালিকা অনুসারে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হবে। সুতরাং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংসদ কেন্দ্রীয় তালিকা, যুগ্ম তালিকা এবং অবশিষ্ট তালিকার বিষয়গুলির উপর নিজের প্রশাসনিক এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। সেই সঙ্গে জরুরি অবস্থা, রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ করার

সূত্রে যেভাবে ২৫৩, ৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারা অনুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে, তেমন শাসনকর্তৃত্বও ঐ বিষয়গুলির উপর করতে পারে। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির প্রশাসন সাধারণভাবে রাজ্যের উপরই থাকে। তবে দুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে ঃ (ক) যদি সংসদ রাজ্যের কিছু শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে প্রয়োজনবোধে তুলে দেয় এবং (খ) সংবিধানের যেসব ধারা যুগ্ম তালিকার কিছু বিষয়কে কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেছে।

২৫৬ ধারা অনুসারে প্রত্যেক রাজ্য শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা এমনভাবে পরিচালনা করবে যাতে সংসদ প্রণীত আইনের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশও দিতে পারে।

২৫৭ ধারায় আবার বলা আছে যে রাজ্যসরকার এমনভাবে রাজ্যের কার্য পরিচালনা করবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। জাতীয় স্বার্থে বা সামরিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাজ্যের অন্তর্গত রেলপথ সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

২৫৮ ধারা অনুসারে, রাজ্যসরকারের সম্মতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি শর্তসাপেক্ষে বা শর্তহীনভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা তার কর্মচারীদের উপর বিশেষ কিছু কার্য সম্পাদনার দায়িত্ব দিতে পারেন।

২৬০ ধারা অনুসারে, ভারত সরকার যেকোন বিদেশী সরকারের সঙ্গে চুক্তির বলে বিদেশী সরকারের অধীনস্থ কোন অংশে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার এক্তিয়ার বর্ধিত করতে পারে।

২৬১ ধারা অনুসারে সকল সরকারি আইন সমগ্র ভারতে সমান মর্যাদার অধিকারী। এছাড়া, ২৬২ ধারা বলে আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারে। তবে এর জন্য সংসদে প্রয়োজনীয় আইন পাস করা প্রয়োজন।

২৬২ ধারা অনুসারে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ মীমাংসা এবং সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করতে পারেন।

এছাড়া প্রশাসনের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত আরক্ষা বাহিনী, প্রভৃতি রাজ্যে প্রেরণ করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের আছে।

মূল্যায়ন ঃ কেন্দ্ররাজ্য প্রশাসনিক সম্পর্ক নিয়ে সংবিধানে যেভাবে নিয়ম তৈরি করা হয়েছে, তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুরোপুরিভাবে সক্ষম একথা প্রায় বলা যেতে পারে। বস্তুত সংবিধানের ২৫৬, ২৫৭, ৩৫৬ ধারাসহ আরও অন্যান্য ধারা কেন্দ্রকে বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই এককেন্দ্রিক করে তুলতে পারে। ফলে রাজ্যের স্বাধিকারের ধারণাটি সাধারণভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

রাজ্যের বিনা অনুমতিতে রাজ্যগুলিতে আধাসামরিক বাহিনী পাঠানোর ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবার ফলে রাজ্য-র উপর কেন্দ্রের দমননীতির প্রয়োগের সম্ভাবনা থেকে যায়। এছাড়া রাজ্যপাল যেহেতু রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যে প্রেরিত হন, সুতরাং রাজ্যপালের মাধ্যমে রাজ্যের উপর নানারকম চাপসৃষ্টি করার সুযোগ

কেন্দ্রের হাতে সব সময়ই থাকে। বিশেষত যদি দেখা যায় কেন্দ্র এবং অঙ্গ রাজ্যের সরকারগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রণ করে, এই ধরনের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সেই কারণেই ১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা প্রমুখ রাজ্যে শাসনসম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবি বারবার উঠে আসছে। এরই সূত্রে ১৯৭১ সালে রাজা রামান্না কমিটি ও ১৯৮৩ সালে সারকারিয়া কমিশন গঠিত হয়। তবে এদের সুপারিশের ফলে অবস্থার যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

০৯.৭ আর্থিক ক্ষমতার বণ্টন

অর্থনৈতিক উৎসটি প্রাণবন্ত রাখতে না পারলে কোন রাষ্ট্রই যথার্থভাবে এগোতে পারে না। সেই কারণে রাষ্ট্রের আর্থিক প্রসঙ্গটি সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিষয়টি ক্রমশ জটিল হয়। কারণ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক দায়দায়িত্ব বণ্টনব্যবস্থা সুস্পষ্ট না থাকলে জটিলতা আরও বাড়ে। সেকথা মনে রেখে সংবিধানের দ্বাদশ অধ্যায় এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একথা প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে দ্বিবিধ সরকারি ব্যবস্থায় আর্থিক দায়দায়িত্বের বণ্টন এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন যে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলি যেন স্বাধিকার রক্ষা করতে পারে। ভারতের সংবিধানে সপ্তম তফশীলে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজস্ব বিষয়ক ক্ষমতার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। (i) কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতার বণ্টনব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্র থেকে কতটা প্রভাবমুক্ত। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে সম্পর্কের বিষয়টিকে চারভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) কেন্দ্র ও রাজ্য কর্তৃক ধার্য কর সংগ্রহ ও বণ্টন করা

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেয় অনুদান

(গ) ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা

(ঘ) অর্থ কমিশন গঠন সংক্রান্ত বিষয়

আমরা একে একে এই চারটি বিষয়ের আলোচনা করব।

(ক) পূর্বোল্লিখিত সপ্তম তফশীলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাকে দুটি তালিকায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৩টি রাজস্ব বিষয়ক ক্ষমতা যার মধ্যে রয়েছে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, আন্তঃরাজ্য ব্যবসাবাণিজ্যের উপর ধার্য কর, কোম্পানির আয়ের উপর কর, কৃষি ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর ধার্য কর, রেলপথ, উৎপাদন কর ইত্যাদি।

অপরদিকে রাজ্য তালিকায় রাখা হয়েছে ১৯টি বিষয়। এর মধ্যে রয়েছে ভূমি-রাজস্ব, কৃষি আয়ের উপর কর, জমির উপর উত্তরাধিকার কর, প্রমোদ কর, বিলাস কর ইত্যাদি। এই দুই তালিকার বহির্ভূত বিষয়গুলির উপর কর ধার্যের ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রের হাতে রয়েছে। তবে রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে যুগ্ম তালিকার কোনও অস্তিত্ব নেই। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রের ভূমিকা ব্যাপক হলেও রাজস্বের সবটাই কেন্দ্রের একক ভোগে লাগে

না। যেমন, সংবিধানের ২৬৮ ধারা অনুযায়ী, স্ট্যাম্প কর, ঔষধপত্র ও প্রসাধনী সামগ্রীর উপর কর কেন্দ্র সংগ্রহ করলেও রাজ্য ভোগ করে। আবার, কৃষিজমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, সম্পত্তি কর ইত্যাদি কিছু কর কেন্দ্র ধার্য ও সংগ্রহ করলেও সংগৃহীত অর্থ রাজ্য সরকার ধার্য ও আদায় করলেও সেই অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থ কমিশনের সুপারিশক্রমে বণ্টন করা হয় (২৭০ ধারা)।

২৭১ নং ধারা অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকার কোনও বিশেষ করের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপাতে পারে এবং সেই অর্থ কেবল কেন্দ্রই ভোগ করতে পারে।

সংবিধান রাজ্যের হাতে যেসব কর সংগ্রহ করার ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়েছে তার ওপরও কিছু নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হাতে রয়ে গেছে। যেমন—বৃত্তি কর, অন্য রাজ্যের কোনও সামগ্রী বিক্রির উপর কর, বিদ্যুতের উপর সুনির্দিষ্ট কর ইত্যাদি। এছাড়া কোন রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সম্পত্তির উপর কর ধার্য করতে পারবে না।

(খ) সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারকে অনুদান প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই অনুদান প্রদানের অর্থ হল বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার সামঞ্জস্য আনা, রাজ্যগুলির রাজস্বের ঘাটতি পূরণ করা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার পাট ও পাটজাত পণ্যের উপর রফতানি মাশুল ধার্য করেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই সব রাজ্যকে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করে।

এছাড়া সংবিধানের ২৭৫ ধারা অনুসারে, তফশীলভুক্ত উপজাতি কল্যাণে অনুদান প্রদান বাধ্যতামূলক।

২৮২ ধারা অনুসারে, বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে অনুদান করতে পারে।

(গ) ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও ২৯২ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ২৯৩ ধারা বলে রাজ্য সরকার কেবল দেশের অভ্যন্তর থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

(ঘ) ২৮০ ধারা অনুসারে, প্রতি পাঁচবছর অন্তর একটি অর্থকমিশন গঠন করতে হবে। এই কমিশনে একজন সভাপতি ও চারজন সদস্য থাকবেন যাঁদের নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ২৮০ (৩) ধারা অনুসারে, অর্থ কমিশনকে মূলত দুটি দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রথমত, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বণ্টনযোগ্য রাজস্ব নির্ধারণ করা ও দ্বিতীয়ত, রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় অনুদান নীতি স্থির করা।

সুতরাং, সংবিধানের বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা করে ভারতে কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি বুঝতে আর্থিক সম্পর্কের দিকটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যায়ন ঃ আইনসংক্রান্ত এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে যেমন বোঝা গিয়েছে যে

উভয় ক্ষেত্রেই অঙ্গরাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব অপরিসীম, আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অর্থ কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশন এই দুই কেন্দ্রীয় আয়োগ রাজ্যের আর্থিক প্রতিকারকে বিপুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষত যদি দেখা যায় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারে যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল শাসন করছে, অর্থবণ্টনের বিষয়টি সেখানেও আরও জটিল হয়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়গুলি নানানভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অঙ্গরাজ্যের শাসকগোষ্ঠীকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। ফলে, অঙ্গরাজ্যের স্বার্থও বিঘ্নিত হবে। এই সব বিষয়গুলি বিবেচনা করে কেন্দ্র রাজ্য ক্ষমতা পুনর্বিন্যাসের কথা বারবার উঠছে এবং সঙ্গতভাবেই কেন্দ্ররাজ্যের আর্থিক সম্পর্কের পুনর্বিবেচনার কথাও এসে যাচ্ছে।

০৯.৮ পরিকল্পনা কমিশন

ভারতের সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক ও সর্বোপরি আইনগত ক্ষমতার যেভাবে বণ্টন করেছে, সেখানে আমরা বারবারই লক্ষ্য করেছি যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরে থেকেও সবসময়ই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা অধিক পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের এইসব নিয়মকানুনকে জোরালো করেছে ভারত সরকারের অবিধিবদ্ধ ও সংবিধান-বহির্ভূত একটি সংস্থা ঃ পরিকল্পনা কমিশন।

পরিকল্পনা কমিশন গঠন করার উদ্দেশ্য হল সমগ্র ভারতের জন্য সুসংহত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা। এই কমিশনের সদস্য সংখ্যা আট। একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, তিনজন মন্ত্রী সদস্য এবং তিনজন অন্যান্য সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। পদাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি। মন্ত্রীসহ অন্যান্য সদস্যদের যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন, তাই নিজের আস্থাভাজন এবং পছন্দসই ব্যক্তিদেরই তিনি নিয়োগ করেন। তাই এই সব ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের মনোমতো এবং রাজনীতি প্রভাবিত ব্যক্তি হয়ে থাকেন।

পরিকল্পনা কমিশনের উদ্দেশ্য রূপায়ণ করার জন্য রয়েছে ১৯টি বিভাগ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, শক্তি, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, শিল্প ও খনি, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি। এইসব বিভাগ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখে এবং প্রয়োজন মতো কমিশনের নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে। দেশের বৈষয়িক, কারিগরীগত, মূলধনী সম্পদ এবং সর্বোপরি মানবসম্পদের মূল্যায়ন এবং বৃদ্ধিসাধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম কাজ। এছাড়া পরিকল্পনা অনুসারে সম্পদের বণ্টন, প্রকল্প সমূহের সফল রূপায়ণের ব্যবস্থা করা এবং পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে মূল্যায়ন করে এই সংস্থা। আমরা জানি, যে কোন পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সমস্যা একটি বড় প্রতিবন্ধক। এই বাধা দূর করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন নানান ধরনের সুপারিশ করে থাকে। এমনকি কোনও কাজের মাঝপথে সমস্যা দেখা দিলে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়াও এই কমিশন রাজ্যের পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে সুপারিশ করে। বাস্তবিক, এই ব্যয়বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজ্যের কোন ভূমিকা নেই। আসলে পরিকল্পনা কমিশনের গঠন থেকে শুরু করে

ব্যয়বরাদ্দ কোন ক্ষেত্রেই রাজ্যের এক্তিয়ারে নেই। রাজ্যগুলির উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, সাফল্য বা যাবতীয় বিষয়গুলিই কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণ যেহেতু পরিকল্পনা কমিশনের ইচ্ছানুসারী বা অনুরূপভাবে পরিকল্পনা কমিশনের নীতি যেহেতু কেন্দ্রীয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাই সর্বার্থেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রমুখীন হয়ে পড়ে। তবে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ করার ক্ষমতা আছে। প্রয়োগ করার কোন ক্ষমতা নেই। সংসদের কাছেও এর কোন দায়দায়িত্ব নেই। অথচ সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তার সুপারিশ দানের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে পরোক্ষভাবে প্রভূত প্রভাবিত করে থাকে। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতি-নীতির বিচারে, বিশেষত আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমিশনের সংবিধান বহির্ভূত এই ক্ষমতা রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে করা হয়।

০৯.৯ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি

আইন, শাসন ও অর্থ, এই তিন ক্ষেত্রের সূত্র ধরে সামগ্রিকভাবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে আমরা যে কেন্দ্রীয় আধিপত্য দেখতে পাই, তা সংবিধান প্রণেতাদের অভীষ্ট হলেও, ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি নানান সময় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বিভিন্ন সময় সংবিধান বিশেষজ্ঞরাও এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা করেছেন। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের উন্নতিবিধানের জন্য নানান প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। এবং মধ্যে উল্লেখ্য রাজারামান্না কমিশন (১৯৭১) এবং সারকারিয়া কমিশন (১৯৮৮)। এছাড়া ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ২৫০০ শব্দের স্মারকলিপি পশ্চিমবঙ্গের ক্যাবিনেটে পাস করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দিয়ে কেন্দ্ররাজ্যের উন্নতির কথা এঁরা সকলেই মনে করেন। এইসব মতামতের কিছু কিছু গ্রহণ করা হলেও এর ফলে কেন্দ্ররাজ্যের সম্পর্কের যে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, তা বলা যাবে না।

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে নানা ধরনের আলোচনা লক্ষ্য করা গেলেও বিশেষত ১৯৬৭ সালের পর থেকে যখন বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে, তখন থেকে এই আন্দোলন আরোও জোরালো আকার নিতে থাকে। ১৯৮৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু দেশম ও কর্ণাটকে জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সমগ্র ভারতে অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলি জোরদার আন্দোলন শুরু করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই বিষয়টি পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য সারকারিয়া কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেন যার কিছু কিছু বক্তব্য পরবর্তীকালে গৃহীত হয়। তবে এই প্রতিবেদন রাজ্যের পক্ষে খুব সুখকর হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা ও আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির কথা এই প্রতিবেদন খুব প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশ করেননি। বরং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যকেই স্বীকার করেছেন।

তবুও কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন করে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের প্রসঙ্গটি বারবারই ঘুরে ফিরে আলোচনার মধ্যে এসে থাকে। মনে করা হয়, আইন, প্রশাসন এবং আর্থিক এই তিনটি ক্ষেত্রেই

ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। যেমন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'অবশিষ্ট ক্ষমতা' রাজ্যের হাতে অর্পণ করা উচিত এবং রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য প্রেরিত রাজ্যের কোন বিল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হবে বলে মনে করা হয়। শাসনবিভাগীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা উচিত। যেজন্য ২৫৬, ২৫৭, ৩৫৬ ও ৩৬৫ ধারা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। এছাড়া রাজ্যপাল নিয়োগের বিষয় এবং সেই সঙ্গে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর প্রয়োগসীমা সম্পর্কে বিচার করা প্রয়োজন এমনভাবে যাতে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় অপশাসনের শিকার না হয়ে উঠতে পারে।

আসলে ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনেক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লেও এর এককেন্দ্রিক প্রবণতা এতোটাই স্পষ্ট যে কিছু সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্ররাজ্যের সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো দুরূহ।

০৯.১০ সারাংশ

ভারতের সংবিধান যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো রচনা করেছে, আপাতদৃষ্টিতে তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলে মনে হতে পারে। যেমন দ্বিবিধ সরকার, লিখিত সংবিধান, সংবিধানের প্রাধান্য ইত্যাদি। কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যায় যে কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও প্রকৃত বিচারে ভারত যুক্তরাষ্ট্র নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরই শাসনের মূল দায়দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধানেও ভারতকে রাজ্যসংঘ বলে কর্ণনা করা হয়েছে।

সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুই স্তরের সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে। বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব প্রচুর। আইনগত, শাসনগত এবং আর্থিক-এই তিন ক্ষেত্রেই মূল দায়িত্ব কেন্দ্রের। রাজ্যের হাতে যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার অনেকাংশই সময় বিশেষে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে। এছাড়া রয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। এই কমিশন একটি উপদেষ্টা সংস্থা হলেও এর প্রভাব কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে।

বর্তমানে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দেওয়া যায় কিনা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কিছু পরিবর্তন ঘটানো যায় কিনা সে সম্পর্কে নানান চিন্তা ভাবনা চলছে।

০৯.১১ অনুশীলনী

১। ভারতকে কি 'যুক্তরাষ্ট্র' বলে অভিহিত করা যায়?

২। ভারতের শাসনব্যবস্থাকে 'আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়' বলা হয় কেন?

৩। ভারতকে একটি 'রাজ্যসংঘ' বলে সংবিধানে বর্ণনা করা হয়েছে কেন?

৪। ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আইন সংক্রান্ত সম্পর্ক কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে?

৫। ভারতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৬। ভারতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক কী ধরনের?

৭। ভারতে কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'পরিকল্পনা কমিশন'-এর ভূমিকা কী?

৮। ভারতে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করুন।

০৯.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। S.L. SIKRI : *Indian Government and Politics,* Kalyani Publishers, Ludhiana 1999.

২। A.S. NARANG : *Indian Government and Politics,* Gitanjali Publishing House, New Delhi 19.

৩। নির্মলকান্তি ঘোষ ঃ *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি,* রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা ১৯৯৭।

৪। সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি,* নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৯৬।

৫। অনাদি কুমার মহাপাত্র ঃ *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি,* সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।

একক ১০ □ রাজ্যের শাসনবিভাগ

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ রাজ্যের শাসনবিভাগ ঃ কাঠামোগত বিন্যাস

১০.৪ রাজ্যপাল ঃ নিয়োগ, যোগ্যতা ও কার্যকাল

১০.৫ রাজ্যপালের ক্ষমতা

১০.৬ রাজ্যপালের শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদা

১০.৭ রাজ্যের মন্ত্রীসভা

১০.৮ মুখ্যমন্ত্রী

১০.৯ সারাংশ

১০.১০ অনুশীলনী

১০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনকাঠামো সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- অঙ্গরাজ্যের শাসনবিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হবেন।
- শাসনবিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন পদাধিকারীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা কীভাবে বণ্টন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- অঙ্গরাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা কে সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা করতে পারবেন।

১০.২ প্রস্তাবনা

ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো যে দ্বিবিধ শাসনব্যবস্থা বহাল করা হয়েছে, তারই একটি হল অঙ্গরাজ্যের শাসন। ভারতে কেন্দ্রীয় স্তরে যেমন সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে, রাজ্যগুলিতেও অনুরূপভাবে সংসদীয় শাসনরীতিই অনুসরণ করা হয়েছে। এই সংসদীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে তাই রাজ্যগুলিতে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে রাজ্যপাল এবং প্রকৃত শাসক হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর অস্তিত্ব দেখতে পাই। কাঠামোগতভাবে কেন্দ্রীয় স্তরে যেমন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে দেখা যায় এবং

প্রধানমন্ত্রী সমগ্র রাষ্ট্রের মুখ্য শাসক হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, অঙ্গরাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা প্রায় তারই সমান্তরাল। তবে নিশ্চিতভাবে, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের মধ্যে এবং প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার প্রয়োগ গুণগতভাবে স্বতন্ত্র।

বর্তমান এককে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদের ভূমিকা নিয়ে আমরা যে আলোচনা করব, সেক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কিছু কিছু তুলনামূলক আলোচনা করব।

১০.৩ রাজ্যের শাসন বিভাগ ঃ কাঠামোগত বিন্যাস

রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসন বিভাগীয় কর্তৃত্বের আধার হলেন রাজ্যপাল। কাঠামোগতভাবে তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। অপরদিকে সংসদীয় রীতি ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজ্যের প্রকৃত শাসনভার অর্পিত হয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর। মন্ত্রীসভার সকল সদস্যদের সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্যশাসন করেন। সংবিধান অনুসারে, রাজ্যপালকে মনোনীত করেন রাষ্ট্রপতি। আবার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যরাও রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। আবার একথা আমরা জানি যে রাষ্ট্রপতি যে কোন কাজই প্রধানমন্ত্রীর পরমার্শক্রমে করেন। কাজেই রাজ্যপালের ক্ষমতার উৎস এবং প্রকৃত ক্ষমতার প্রয়োগ কীভাবে এবং কেমন করে ঘটে থাকে সে সম্পর্কে আলোচনার নানান অবকাশ আছে। তবে সেইসব আলোচনার আগে, আমরা একে একে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসন বিভাগের নানা অংশের ক্ষমতা ও কাজকর্মের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করব।

১০.৪ রাজ্যপাল ঃ নিয়োগ, যোগ্যতা ও কার্যকাল

সংবিধানের ১৫৩ ধারা অনুসারে, প্রত্যেক রাজ্যে একজন রাজ্যপাল থাকবেন। একই ব্যক্তি প্রয়োজনে দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্যপালও থাকতে পারবেন।

১৫৪ ধারা বলে রাজ্যের-শাসনক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে এবং তিনি এই ক্ষমতা সংবিধান অনুসারে প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন।

১৫৫ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। এবং রাজ্যপালের অধিষ্ঠান রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন (১৫৬ ধারা)।

সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত হতে গেলে তাঁর কয়েকটি বিশেষ যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন (ক) রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। (খ) তাঁর অন্তত পক্ষে ৩৫ বছর বয়স হতে হবে। (গ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য কোন আইনসভারই তিনি সদস্য হতে পারবেন না। (ঘ) রাজ্যপাল অন্য কোনও লাভজনক পদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। (ঙ) বিনা ভাড়ায় কার্যক্ষেত্রে থাকার সুবিধা, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা

তিনি ভোগ করবেন এবং তাঁর কার্যকালের মধ্যে অসুবিধাজনকভাবে বেতন, ভাতা ইত্যাদি হ্রাস করা যাবে না।

রাজ্যপালের কার্যকাল আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন। তাই কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেও প্রয়োজনবোধে রাজ্যপালকে অপসারিত করা হতে পারেন। আবার রাজ্যপালও কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে নিজেই পদত্যাগ করতে পরেন।

রাজ্যপাল অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ার ফলে বিষয়টি বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। অনেকেই রাজ্যপালের পদটিকে রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন নির্ভর না করে জনগণ কর্তৃক ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নির্বাচনভিত্তিক করা উচিত বলে অনেকেই মনে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের খসড়া কমিটি নির্বাচনভিত্তিক রাজ্যপাল নিয়োগের কথা প্রস্তাব করে। এই বিষয়ে গণপরিষদে চারটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়। যেমন (ক) জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন (খ) রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন (গ) রাজ্যের নিম্নতম সভা কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে প্রেরিত ব্যক্তিদের নামের ভিতর থেকে রাজ্যপালের নির্বাচন এবং (ঘ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচন।

গণপরিষদ শেষোক্ত পদ্ধতিই গ্রহণ করে। এর পিছনে অবশ্য কিছু যুক্তিও উপস্থাপিত করা হয়। মনে করা হয় রাজ্যপালও যদি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরূপে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহলে নির্বাচিত মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে রাজ্যপালের বিরোধ বাধতে পারে। সেক্ষেত্রে সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালকে মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে যা শেষ পর্যন্ত জটিলতা সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয়ত আইনসভা রাজ্যপালকে নির্বাচন করলে রাজ্যপাল আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়তে পারেন এবং দলব্যবস্থার উপস্থিতি এই অবস্থাকে গুরুতর করে তুলতে পারে। এই ব্যবস্থায় রাজ্যপাল দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না। আসলে রাজ্যপালের পদকে নিরপেক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার মানসিকতাই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত রাজ্যপালের তত্ত্বকে গ্রহণ করে। তবে একথা এই সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে রাজ্যপালের বিভিন্ন ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারব যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রেখে যে কেন্দ্রাভিমুখী ক্ষমতা-কাঠামো তোলার প্রচেষ্টা সংবিধান প্রণেতারা করেছিলেন, রাজ্যপাল নামক ব্যক্তিত্বটিকে সেই অনুসারেই তাঁরা গড়তে চেয়েছিলেন।

পরবর্তী অংশে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করলে সে সম্পর্কে আমরা কিছুটা অবহিত হব।

১০.৫ রাজ্যপালের ক্ষমতা

সংবিধান অনুসারে, রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতেই ন্যস্ত থাকবে। এই ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করবেন নিজে বা তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের সাহায্যে। উল্লেখ্য, রাজ্যপালের ক্ষমতার প্রশ্নে সংবিধান তাঁর স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা (discretionary powers) ও অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করেছে।

সংবিধানের ১৬৩(১) ধারা স্পষ্টভাবেই বলেছে, যেসব বিষয়ে রাজ্যপালের স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না, সেই সব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বসহ মন্ত্রীসভা রাজ্যপালকে পরামর্শদান ও কার্য পরিচালনায় সহায়তা করবেন। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু রাজ্যের প্রকৃত শাসক, সেই কারণে রাজ্যপালের ক্ষমতাও অনেকটাই নিয়মতান্ত্রিক বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এমন কিছু ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারেন যে তখন তাঁকে কেবলই নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায় না। রাজ্যপালের ক্ষমতার শ্রেণীবিভাজন করলে বিষয়টি বোঝা যাবে।

ক. শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্যপাল যেহেতু রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, সেই কারণে রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্মই তাঁর নামে হয়ে থাকে। এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে দু-ধরনের ক্ষমতা ঃ নিয়োগসংক্রান্ত এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ক্ষমতা। প্রথমত, তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করেন। এছাড়া, রাজ্যের মহাব্যবহারিক (advocate general), রাজ্যসরকারি রাষ্ট্র কৃত্যক কমিশনের সদস্যদের তিনি নিয়োগ করেন। দ্বিতীয়ত, সংবিধান অনুসারে, মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীর কার্যকাল রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন। রাজ্যপাল শাসনকার্য সুপরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেন বিভিন্ন রাজ্যে তফশিলি জাতি ও উপজাতি, অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণের ভার রাজ্যপালের উপর দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার রাজ্যপালগণ একজন করে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তফশিলি জাতি, উপজাতি ও এলাকার শাসনকার্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালকে প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হয়।

খ. আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির মতো রাজ্যপালও আইনসভার সদস্য হতে না পারলেও রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (১৬৪ ধারা) রাজ্যপালই রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশন স্থগিত রাখেন এবং প্রয়োজন মনে করলে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া কোন বিলই আইনে পরিণত হতে পারে না। কোন বিল বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত হবার পর তাঁর সম্মতি জন্য পাঠানো হয়। রাজ্যপাল সব ক্ষেত্রে যে সম্মতি দেবেন, তা নয়। এমনকি তিনি বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন। তবে অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের এ ধরনের ক্ষমতা নেই কোন কোনও বিল তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন। এছাড়া আইনসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কিছু বিষয় রাজ্যপালের এক্তিয়ারভুক্ত। যেমন, (ক) রাজ্য আইনসভায় বক্তৃতা দেওয়া বা বাণী পাঠানো (খ) বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন সাময়িক অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারেন (গ) যেসব রাজ্যের আইনসভায় দুটি পরিষদ আছে, সেখানে রাজ্যপাল উচ্চতর কক্ষ বা বিধানপরিষদে চারুকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কয়েকজনকে মনোনীত করতে পারেন। এছাড়া (ঘ) প্রয়োজনবোধে রাজ্যের আইনসভায় ইঙ্গভারতীয় সম্প্রদায় থেকে একজন সদস্যকে তিনি বিধানসভায় মনোনীত করতে পারেন।

গ. অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

বিধানসভায় গৃহীত অর্থবিল সম্মতির জন্য পাঠানো হলে সেই বিলে রাজ্যপাল পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন না অর্থাৎ এক অর্থে অর্থবিলে তাঁর সম্মতিপ্রদান বাধ্যতামূলক। আবার অন্যদিকে অর্থসংক্রান্ত কোন বিল বিধানসভায় পেশ করতে হলে রাজ্যপালের অনুমতি আবশ্যক। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শুরুতে তিনি অর্থমন্ত্রী মারফত আইনসভায় আর্থিক বিবৃতি বা বাজেট পেশ করবার ব্যবস্থা করে থাকেন। বাজেট অধিবেশন শুরু হবার আগে তিনি বিধানসভায় (যে সব রাজ্যে দ্বিকক্ষব্যবস্থা আছে সেখানে যৌথ অধিবেশনে) আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়ে থাকেন।

ঘ. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্যের জেলাসমূহের বিচারক ও বিচারবিভাগীয় কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, কর্মস্থল ইত্যাদি বিষয়ে আদেশ প্রদান রাজ্যপালের বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত। তবে রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা তাঁর নেই। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি (২১৭ ধারা অনুসারে) রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ১৬১ ধারা অনুসারে, কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধীকে ক্ষমা করার বা অপরাধীর দণ্ডাদেশ হ্রাস বা স্থগিত করার সীমিত ক্ষমতা রাজ্যপালের থাকলেও মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীকে ক্ষমা প্রদর্শনের কোনও ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই। সংবিধানের ১৯১ ধারা অনুসারে, রাজ্য আইনসভায় কারা সদস্য হতে পারবেন না তা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে কোনও বিরোধ দেখা দিলে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা রাজ্যপালের। তবে তিনি সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের মতামত নেবেন।

ঙ. স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

ভারতের সংবিধান রাজ্যপালকে বিশেষভাবে এমন কিছু ক্ষমতা দিয়েছে যার সমান্তরাল কোন ক্ষমতা স্বয়ং রাষ্ট্রপতিরও নেই। এই ক্ষমতাকেই বলা হয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা যা তিনি মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার পরামর্শ ব্যতিরেকেই প্রয়োগ করতে পারেন। শুধু তাই নয়, কোনও বিষয় সম্পর্কে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ারও স্বয়ং রাজ্যপালেরই। ৩৬৩ ধারায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে এ ব্যাপারে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। এই বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ঃ (ক) আসামের স্বশাসিত উপজাতি অঞ্চলের খনি রয়্যালটি ও উপজাতি অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের নিজস্ব ক্ষমতার কথা। (খ) রাষ্ট্রপতি নাগাল্যান্ডের রাজ্যপালকে আইন ও নিরাপত্তা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব দিতে পারেন। নাগাবিদ্রোহীদের কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যেই এই ক্ষমতা যে প্রদান করা হয়েছে, তা বোঝা যায়। (গ) মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ঐ দুই রাজ্যের রাজ্যপালের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। (ঘ) অনুরূপভাবে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতি মণিপুরের রাজ্যপালকে সেই রাজ্যের বিধানসভার কমিটিতে পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিনিধি নিয়োগের বিশেষ দায়িত্বও দিতে পারেন। (ঙ) সিকিমের রাজ্যপালকেও রাজ্যের শান্তি রক্ষার্থে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালের হাতে আরও কিছু ক্ষমতা রয়েছে যেগুলি তিনি প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারেন। তবে সেগুলি রাজ্যপালের ক্ষমতা বলে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়নি। যেমন, (ক) মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ সম্পর্কে তাঁর আপন বিচার বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। সাধারণত, নিয়মানুসারে, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে হয়। তবে বিধানসভায় যদি কোনও বিশেষ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে, সেক্ষেত্রে রাজ্যপালের এই ক্ষমতা প্রয়োগের উপলক্ষ্য দেখা দেয়। এই ধরনের অবস্থায় ক্ষমতা প্রয়োগের কিছু উদাহরণ আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখেছি। যেমন, ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার গঠনকালে। (খ) যদি রাজ্যবিধানসভায় সরকারি দলের কিছু সদস্যের দলত্যাগ করার ফলে মন্ত্রীসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়, তবে রাজ্যপাল মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করতে পারেন। (গ) সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাজ্যের সাংবিধানিক অচলাবস্থা ঘটলে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট পাঠানো রাজ্যপালের অন্যতম কর্তব্য। সেক্ষেত্রে তিনি যদি মনে করেন রাজ্যে জরুরী অবস্থা জারী করা প্রয়োজন, তিনি অনুরূপ মতামতও পাঠাতে পারেন। (ঘ) সাংবিধানিক অচলাবস্থার কারণে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হলে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশ দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাজ্যে ওই ভূমিকা পালন করতে পারেন। (ঙ) বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত কোন বিল তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে বিষয়টিকে আইনে রূপান্তরিত করা থেকে কিছুদিন পিছিয়ে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন।

উপরের আলোচনা থেকে রাজ্যপালের ক্ষমতা সম্পর্কে যে ধারণা করা গেল, তার ভিত্তিতে রাজ্যপাল পদের অবস্থান এবং প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু কিছু প্রশ্ন জাগে। রাজ্যপালের নানান ক্ষমতা, বিশেষত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিবেচনা করে আমরা তাঁর প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হতে পারি।

১০.৬ রাজ্যপালের শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদা

ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা নেহাতই নিয়মতান্ত্রিক নাকি তিনি অপেক্ষাকৃতভাবে কিছুটা স্বাধীন, তা নিয়ে নানান সময় বিতর্ক উঠেছে। এই বিতর্কে কখনও বা স্বয়ং রাজ্যপালও অংশগ্রহণ করেছেন, আবার সাংবিধানিক সঙ্কটের সূত্রে নানান সময় বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্যপালের প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। ফলে, সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। যেমন, একদল সংবিধান বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে কেন্দ্রের শাসনব্যবস্থায় যেমন রাষ্ট্রপতি, তেমনি রাজ্যস্তরে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করেন। এরই বিপরীত মতামত আর একদল বিশেষজ্ঞের যাঁরা রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপালকে পুরোপুরি নিয়মতান্ত্রিক হিসাবে মেনে নিতে নারাজ। উভয় মতের বিশেষজ্ঞরাই তাঁদের যুক্তির স্বপক্ষে রাজ্যরাজনীতির নানান উদাহরণ পেশ করেছেন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, রাজ্যপালকে যেমন নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে রাজ্য মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হয়েছে, অন্যদিকে বিভিন্ন সময়

বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। একদিকে যেমন বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালদের ইচ্ছানুসারে বদলি এবং বরখাস্ত করেছেন, তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেছেন। সেইসব উদাহরণ মনে রেখে যে প্রশ্নটি উঠে এসেছে তা হল মন্ত্রীসভা যেহেতু যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল, তাকে উপেক্ষা করে কেবল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার দোহাই তুলে এভাবে একের পর এক রাজ্যপালগণ গণতন্ত্রের প্রতি এভাবে উপেক্ষা দেখান কীভাবে। তাই যেসব সংবিধান বিশেষজ্ঞ রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবেই মনে করেন তাঁরা তাঁদের সুনির্দিষ্ট কিছু যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। তাঁদের মতে (ক) মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়মতান্ত্রিক। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং তাঁর পরামর্শক্রমে মন্ত্রীসভার সদস্যদের তিনি নিয়োগ করতে বাধ্য। (খ) সংসদীয় নিয়মানুসারে, মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও তাঁর ক্ষমতা সীমিত। (গ) রাজ্যপালের সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব নির্ভর করলেও এই সন্তুষ্টি রাজ্যপালের ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টিও সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনেই। তাই তিনি কোনক্রমেই একনায়কোচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। (ঘ) সর্বোপরি, রাজ্যপাল যেহেতু জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত রাজ্যপাল, তাই মন্ত্রীসভার দায়িত্ব বিধানমণ্ডলীর উপর, রাজ্যপালের উপর নয়।

এইসব কিছু বিবেচনা করে রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ঊর্ধ্বে ভাবতে রাজী নন এইসব বিশেষজ্ঞরা।

এর উত্তরে বিপরীত মতের বিশ্লেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন যে রাজ্যপাল যদি কেবল নিয়মতান্ত্রিক শাসকই হবেন, তাহলে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন কীভাবে। কারণ তাঁরা স্পষ্টতই দেখিয়েছেন যে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে রাষ্ট্রপতিকে যেমন সকল ক্ষেত্রেই মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকেন, রাজ্যপালের ক্ষেত্রে সেরকম কোনও বাধ্যতা আরোপ করা হয়নি। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার ক্ষেত্রে যে পূর্ণ স্বাধীনতা রাজ্যপালের উপর রাখা হয়েছে তা নিশ্চয়ই রাজ্যপালের আসনকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। আবার মুখ্যমন্ত্রীরও যেহেতু রাজ্যপালকে রাজ্যের যাবতীয় বিষয় জানাবার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে, সেই ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ কোনও নির্দেশ দিলে তা মানার দায়িত্বও মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখা বা বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রাজ্যপাল যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করেননি তা ভারতীয় রাজনীতিতে বারবারই ঘটেছে। সেসবই সংবিধানকে উপেক্ষা করে যে রাজ্যপালগণ করেছেন এমনও নয়।

পরস্পর বিরোধী এই উভয় বক্তব্য মনে রেখে রাজ্যপালের পদমর্যাদা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা কিছুটা দুরূহ। এছাড়া রাজনৈতিক পালাবদলের সূত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যরাজনীতির নানান উত্থান পতন লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারব রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকার সরলীকরণ সম্ভব নয়। বিশেষত ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে রাজ্যপালের পদ ও ভূমিকা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন উঠেছে।

কেন্দ্রীয় তথা রাজ্যরাজনীতির ইতিহাসের দিকে তাকালে আমাদের অসংখ্য উদাহরণ চোখে পড়বে। ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে যেহেতু কংগ্রেস সরকার নেতৃত্ব দিয়েছে, কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্কে দ্বিধা থাকলেও সরাসরি কোনও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়নি। কিন্তু এই নির্বাচনে অনেকগুলি রাজ্যে যেহেতু অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় এল এবং কোথাও কোথাও কংগ্রেস সংখ্যালঘিষ্ঠ শক্তি হিসাবে পর্যবসিত হল, কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত শাসক দল হিসাবে কংগ্রেস রাজ্যরাজনীতির ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে দিয়ে নানানভাবে রাজ্যরাজনীতিতে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। ফলে, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রমুখ রাজ্যে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সংঘাত বাধতে শুরু করল। মুখ্যমন্ত্রীরা যেখানে রাজ্যপালের পদকে কেবল নিয়মতান্ত্রিক শাসক ছাড়া অন্য কোন মর্যাদা দিতে নারাজ, সেখানে কোনও কোনও রাজ্যপাল তাঁদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজেদের রাজনৈতিক শাসক হিসাবে প্রতিফলিত করতে চাইলেন। এই অবস্থা চলেছিল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যতদিন না পর্যন্ত কংগ্রেস কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে। ইতিমধ্যে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি রাজ্যপালের ভূমিকা সম্পর্কে খতিয়ে দেখার জন্য কাশ্মীরের রাজ্যপাল ভগবান সহায় এবং আরও চারজন রাজ্যপাল নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তাঁদের রিপোর্টে বলা হয় যে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ রাজ্যপালের কাছে বাধ্যতামূলক, যদিও প্রয়োজনে রাজ্যপাল কোন বিষয়ে আপত্তি লিখিতভাবে রেকর্ডে রাখতে পারেন। ইতিহাস বলে ভারতের রাজ্যরাজনীতির ঘূর্ণিপাকে রাজ্যপালকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে বারবার। মনোনীত ভূমিকা পালন করতে না পারলেই রাজ্যপাল অপসারণ করার ঘটনা প্রায়শই ঘটেছে। কেবল পাঞ্জাবেই ১৯৮১ সাল থেকে, পাঁচ বছরে সাতবার রাজ্যপাল বদল ঘটেছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলিতে রাজ্যপালের জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর বারবার আঘাত হেনেছে। ১৯৮১ সালে কেরালায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সি পি আই (এম) সরকার গড়ার দাবি থাকলেও, কংগ্রেস (আই) নেতা করুণাকরণকে সরকার গড়তে রাজ্যপাল আহ্বান জানান—যদিও ১৪১টি আসনের সূত্রে ১৭টি ছিল কংগ্রেস (আই)-র এবং অন্যান্য দলের ৭১ জন সমর্থক করুণাকরণের সঙ্গে ছিলেন। এক্ষেত্রে রাজ্যপাল প্রভূত পরিমাণে সমালোচিত হন। এই সরকারের পতনও হয় এক বছরের মধ্যে। আসামেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এইভাবে ১৯৮২-তে হরিয়ানার, জিডিতপসে, ১৯৮৩ তে কর্ণাটকে গোবিন্দ নারায়ণ রাজ্যপাল হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার তত্ত্ব উপেক্ষা করে নিজের ক্ষমতার ব্যবহার করেন। সিকিমে নরবাহাদুর ভাণ্ডারীর সঙ্গেও রাজ্যপালের বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে রাজ্যপাল শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল করেন। ১৯৮৪-তে অন্ধ্রপ্রদেশে রাজ্যপাল রামলাল রামা রাওয়ের মন্ত্রীসভা ভেঙে দেন তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার কোন সুযোগ না দিয়েই। এই ঘটনার জেরে রামলালকে রাজ্যপালের পদ থেকে চলে যেতে হয় এবং সেইস্থানে শঙ্করদয়াল শর্মাকে বসানো হয়। ১৯৮৯ সালে কর্ণাটকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এই অজুহাতে বোম্বাই মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের পরামর্শে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্যপালদের পদত্যাগপত্র দিতে বলেন রাষ্ট্রপতি। ১৩টি রাজ্য ও ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্যপাল অপসারিত করা হয়। এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে তদনীন্তন বিরোধী দল কংগ্রেস। কিন্তু ১৯৯১ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে নরসিং রাও মন্ত্রীসভার সময় ১৪ জন রাজ্যপাল বদল করা হয়। উল্লেখ্য, এইসব রাজ্যপাল ভি পি সিং এবং চন্দ্রশেখর

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৯৮ সালে উত্তরপ্রদেশে রমেশ ভান্ডারী এবং ১৯ সালে বিহারে বিনোদ পাণ্ডের ভূমিকাও রাজ্যপালের অগণতান্ত্রিক আচরণের উদাহরণ তুলে ধরে। সুতরাং এইভাবে অকারণে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া, রাজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট পাঠানো, ৩৫৬ ধারার প্রয়োগের প্ররোচনা দেওয়া এবং কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে অগণতান্ত্রিক কাজকর্ম করার ধারাবাহিক নজির রাজ্যপালের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে সংবিধানের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারা যেভাবে রাজ্যপালের ক্ষমতাকে নির্ণয় করেছে, সেখানে অনেকক্ষেত্রেই রাজ্যপাল সাংবিধানিক ব্যবস্থার অসহায় শিকার হয়ে পড়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করার মধ্য দিয়ে রাজ্য রাজ্যনীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের যে ধারা বর্তমানে বহমান, সেখানে রাজ্যপালের পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের পছন্দমতো ব্যক্তিকে রাজ্যপাল নিয়োগের প্রথা সবসময়ই বজায় রাখতে চান এদেশের শাসককুল। রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ব্যক্তিকে রাজ্যপাল নিয়োগ করা বা কোন ব্যক্তিকে কোন রাজ্যে রাজ্যপাল নিয়োগের পর তাঁকে যদি স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে না দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়, তাহলে রাজ্যপালের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবেই। কর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম করলেই তা শাস্তিযোগ্য বলে যদি রাজ্যপালের উপর রাজনৈতিক চাপ রাখা হয়, তা যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

১০.৭ রাজ্যের মন্ত্রীসভা

সংবিধানের ১৬৩ (১) ধারা অনুসারে, রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং তাঁর কাজে সহায়তার জন্য রাজ্যে একটি মন্ত্রীপরিষদ্ থাকবে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত নিয়োগই একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হয়। যেমন বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। মন্ত্রীসভায় যাঁরা স্থান লাভ করেন তাঁদের প্রত্যেককেই আইনসভার সদস্য হতে হয়। সদস্য নয় এরকম কোনও ব্যক্তিকে ছ'মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য হতে হয় নইলে পদত্যাগ করতে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, যদি কোন অঙ্গরাজ্যের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হয়, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রী উচ্চকক্ষের সদস্যও হতে পারেন।

সংবিধান অনুসারে, রাজ্য মন্ত্রীসভার কার্যকালের মেয়াদ সাধারণত পাঁচ বছর এবং যতদিন তাঁরা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন, ততদিন তাঁদের পদচ্যুত করা যায় না। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাক্রমে কোনও বিশেষ মন্ত্রী পদচ্যুত হতেই পারেন বা ভিন্ন দপ্তরের ভার নিতে পারেন। রাজ্য মন্ত্রীসভায় সাধারণত তিন ধরনের মন্ত্রী থাকেন—ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। ক্যাবিনেট মন্ত্রী বলতে সেইসব মন্ত্রীদেরই বোঝানো হয় যাঁরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির ভারপ্রাপ্ত হন এবং সরকারের নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন রাষ্ট্রমন্ত্রীরা। তাঁরা কোন কোন সময় স্বাধীনভাবে মন্ত্রীসভায় থাকতে পারেন। এছাড়া রয়েছেন উপমন্ত্রী

যাঁরা সাধারণত বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের অধীনে থেকে কাজ করেন এবং তাঁদের কাজে সাহায্য করেন। এঁরা সকলেই বিভিন্ন হারে বেতন, ভাতা এবং আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন।

সংবিধানে রাজ্য মন্ত্রীপরিষদ সম্পর্কে আলাদা কিছু লেখা না থাকলেও সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় মন্ত্রীপরিষদ সম্পর্কে যেসব উল্লেখ রয়েছে, সেখান থেকে আমরা মন্ত্রীপরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে নানা আভাস পাই।

মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে রাজ্য আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল। রাজ্যপালকে তাঁর কাজে সাহায্য করা মন্ত্রীসভার কর্তব্য। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রীসভা তার সুনির্দিষ্ট কাজ করবে। সেক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়মনীতি মন্ত্রীসভার সদস্যরা মেনে চলেন। রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা বজায় রেখে তাঁদের চলতে হয়। কারণ এই আস্থা বজায় রাখলে রাজ্যপাল মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করতে পারেন না। মন্ত্রীসভা সব সময়ই ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেন। মন্ত্রীসভার উপর যেসব দায়িত্ব রয়েছে সেগুলি উল্লেখ করলে বোঝা যাবে যে মন্ত্রীসভার দায়দায়িত্বর পরিমাণ বিপুল।

প্রথমত, সংবিধানে রাজ্যসরকারের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেইসকল বিষয়ে নীতি নির্ধারণ মন্ত্রীসভার প্রধান কাজ। দ্বিতীয়ত, নীতিগুলির বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্বও মন্ত্রীসভার উপর। এইসব নীতিরূপায়ণের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলি দূর করে নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করাই মন্ত্রীসভার উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। তৃতীয়ত, অঙ্গরাজ্যের জন্য যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়, সেগুলি আইনসভায় বিলের আকারে উপস্থাপিত করার প্রাথমিক কাজ মন্ত্রীসভাতেই আলোচিত হয়। অর্থাৎ আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভাই কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। চতুর্থত, মন্ত্রীসভা কর্তৃক নির্ধারিত নীতির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য মন্ত্রীসভাকে প্রশাসনকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হয়। কোনও বিভাগে কোনও নীতি প্রয়োগে সমস্যা থাকলে তা সমাধানের উদ্যোগও মন্ত্রীসভাকেই গ্রহণ করতে হয়। এর উপরই নির্ভর করে বিশেষ কোন মন্ত্রীসভার সাফল্য ও ব্যর্থতা। পঞ্চমত, সরকারি আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও মন্ত্রীসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শুরুতেই অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন এবং সেই বাজেট রাজ্য আইনসভায় বিতর্ক-র মধ্য দিয়ে অনুমোদন লাভ করে এবং তদনুসারে সরকার অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়। নতুন করস্থাপন বা ব্যয়মঞ্জুরী দাবি সংক্রান্ত বিল রাজ্যপালের অনুমোদনসাপেক্ষ আইনসভায় উত্থাপন করা হয়। আবার রাজ্যপাল এই উত্থাপনের অনুমোদন দেন মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শক্রমে। সুতরাং কার্যত মন্ত্রীসভার সমর্থনেই বার্ষিক আয় ব্যয় বরাদ্দ রাজ্য আইনসভায় উপস্থাপিত হয়। ষষ্ঠত, আইনসভার অধিবেশন স্থাপিত থাকাকালীন কোন বিষয়ে যদি অর্ডিন্যান্স জারী করার প্রয়োজন হয়, রাজ্যপাল তা মন্ত্রীসভার পরামর্শক্রমে করে থাকেন বা পরবর্তীকালে আইনসভার অধিবেশন শুরুর ছ'সপ্তাহের মধ্যে আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। সর্বোপরি, রাজ্যের শাসনবিভাগের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং তাদের কার্যের সীমা নির্ধারণ করার দায়িত্ব মন্ত্রীসভার উপর রয়েছে। তা না হলে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া মন্ত্রীসভা যেহেতু তাদের যাবতীয় কাজের জন্য যৌথভাবে দায়িত্বশীল, তাই বিভিন্ন দপ্তর ক্যাবিনেট নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইনসভার উপর কাজের চাপ এতো বেশি বেড়ে গেছে যে মন্ত্রীসভাকেই নীতিপ্রণয়নের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। তাই সংবিধান আলাদাভাবে চিহ্নিত না করলেও বর্তমান সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীসভার কাজকর্ম বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে মন্ত্রীসভার কাজকর্ম সব কিছুই নির্ভর করে যোগ্য নেতৃত্বের উপর। সুতরাং মন্ত্রীসভার নেতৃত্বে যেহেতু রেন মুখ্যমন্ত্রী, তাই শাসনব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা আলোচনা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

১০.৮ মুখ্যমন্ত্রী

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মুখ্য শাসক হিসেবে আমরা যাঁকে দেখতে পাই, তিনি মুখ্যমন্ত্রী। সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। রাজ্যরাজনীতির কেন্দ্রে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী যিনি একই সঙ্গে বিভিন্ন দায়দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপালের স্থান সর্বোচ্চ হলেও তাঁকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বাদে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি শাসন করেন। ফলে রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী কার কতটা ভূমিকা সে সম্পর্কে বিরোধ বিতর্কের সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করতে হলে বিভিন্ন দিক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যধারা বিচার করা প্রয়োজন।

একথা প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে সংসদীয় রাজনীতির হাত ধরে বিশেষত অঙ্গরাজ্যের মুখ্যশাসক হিসাবে যিনি ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করেন, তাঁকে নানান বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। বিশেষত, ভারতের মতো বৈচিত্রপূর্ণ দেশে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যেরই এমন কিছু স্থানীয় বা প্রাদেশিক সমস্যা থাকে যেগুলি স্বতন্ত্রভাবে সমাধান করতে হয়। অসমের বোরো জঙ্গীর সমস্যা, বিহার বা উত্তরপ্রদেশের জাতপাতের লড়াই জনিত সমস্যা থেকে অতি অবশ্যই আলাদা। সেক্ষেত্রে এইসব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরও এইসব সমস্যা নিজেদের মতো করে মোকাবিলা করতে হয়। বিচার করে দেখলে আমরা একথাও হয়তো বা মেনে নেব যে এইসব প্রাদেশিক সমস্যাগুলির ভিতর থেকেই রাজ্য নেতৃত্ব উঠে আসে। তাই সঠিক ব্যক্তি সঠিক রাজ্যে মুখ্যশাসকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম না হলে রাজ্যে জটিলতা বাড়ে।

নিয়োগ, কার্যকাল ও সুযোগসুবিধা

সংবিধান অনুসারে যদিও রাজ্যপালের হাতেই মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা রক্ষিত, তবু রাজ্যপাল এক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়মেই নিয়োগকার্য সম্পাদন করেন। সাধারণত বিধানসভায় কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে রাজ্যপাল ঐ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাজ্য আইনসভার নির্বাচিত সদস্য না হলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। যে সকল রাজ্য আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট, সে সকল ক্ষেত্রে তিনি উচ্চকক্ষের সদস্য হলেও মুখ্যমন্ত্রীত্ব পেতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আইনানুসারে বেতন, ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা তিনি লাভ করেন।

১৬৭ ধারা অনুযায়ী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কিছু সুনির্দিষ্ট দায়দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, রাজ্যের

শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এবং আইন বিষয়ক যাবতীয় প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে রাজ্যপালের গোচরে আনা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। দ্বিতীয়ত, রাজ্যপাল চেয়ে পাঠালে আইন বিষয়ক প্রস্তাব এবং শাসনসংক্রান্ত তথ্যাদিও মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ জানাতে বাধ্য। তৃতীয়ত, মন্ত্রীপরিষদে বিবেচিত হয়নি অথচ কোন বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রাজ্যপাল সে বিষয়ে মন্ত্রীসভার কাছে বিবেচনার জন্য দাবি করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে রাজ্যপালের ইচ্ছানুসারে তা মন্ত্রীসভার কাছে উপস্থিত করতে হয়। রাজ্যপালের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর এই তিনটি ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার কথা বাদ দিলেও মুখ্যমন্ত্রীর করণীয় নানান দায়দায়িত্ব রয়েছে। যেমন—

(ক) রাজ্যসরকারের মুখ্য প্রশাসক হলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ, তাঁদের দফতর বণ্টন এবং পদত্যাগ পত্র গ্রহণের বিষয়ে রাজ্যপালকে যথাযথ পরামর্শ দেওয়া তাঁর কাজ। প্রয়োজনে তিনি রাজ্যপালকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের ভিতর থেকে একজনকে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করার পরামর্শও দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী পরিচালিত মন্ত্রীসভা ক্যাবিনেটমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। প্রয়োজনে তিনি একাধিক সংসদীয় সচিবও নিয়োগ করতে পারেন।

(খ) মন্ত্রীসভার বিভিন্ন বৈঠকে নেতৃত্বপ্রদান, বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় সাধন, প্রয়োজনে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি মন্ত্রীসভা সংক্রান্ত নানান কাজ মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ারভুক্ত। কার্যক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা যথেষ্ট ব্যাপক এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রীসভা তথা রাজ্যরাজনীতির উত্থানপতন ঘটে। যে কোন দফতরের সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করা এবং সমাধানে সচেষ্ট থাকা তাঁর কাজ। সুতরাং সামগ্রিকভাবে কোন কাজের জন্য মন্ত্রীসভা যৌথভাবে দায়িত্বশীল হলেও মুখ্যমন্ত্রীকে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। রাজ্যের রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে সেতুবন্ধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য যদি কোন মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপাল আলাদাভাবে আলোচনা করতে চান, সে ব্যাপারেও মুখ্যমন্ত্রীর সম্যক অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নেতৃত্বের দৃঢ়তা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে মন্ত্রীসভাকে সুসংহত করা তাঁর কাজ। এইসব কারণে তিনি মন্ত্রীসভার মূলস্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হন।

(গ) আইনসভার অভ্যন্তরে সরকারি দলের নেতৃত্বে থেকে যাবতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া, মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম কাজ। রাজ্যের কোথায় কী ঘটছে, আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কোথায় উন্নতি বা অবনতি ঘটছে এ সম্পর্কে আইনসভায় দলের, কোন কোন সময় শরিকী দলের এবং সর্বোপরি বিরোধী দলের প্রশ্ন এবং সমালোচনার জবাব দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়। আইনসভার নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভা এবং আইনসভার যেমন নেতৃত্ব দেন, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দলীয় কর্মসূচীর রূপায়ণ, আদর্শগত অবস্থানের প্রচার, জনসমক্ষে উপস্থিত হয়ে নিজস্ব এবং দলের ভাবমূর্তি বজায় রেখে বক্তৃতা প্রদান এবং দলের আভ্যন্তরীণ উপদলীয় বিরোধিতার সমাধান এবং ভারসাম্য বজায় রাখা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। প্রকৃতপক্ষে দলের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে না পারলে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

(ঙ) আইনসভার ভিতরে তো বটেই, বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বৃহত্তর রাজনীতিতে বিশেষ রাজ্যের সরকারের নেতা হিসাবে দেখা যায়। বিশেষত, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীই সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্যের মুখ্য প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেন। রাজ্যের আর্থিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে আন্তঃরাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন (যথা নদীর জলবণ্টন), খরা-বন্যা-ভূমিকম্প-র মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কেন্দ্র থেকে নানান সাহায্য আহরণ করা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সদর্থক ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী। এমনকি অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(চ) অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এছাড়া আরও কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে কাজ করতে হয়। যেমন, বার্ষিক বাজেট পেশ করার আগে অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া, প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়া, রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, রাজ্যের উন্নয়ন কেন্দ্রিক নানান কমিটি, কমিশন, বোর্ড ইত্যাদির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, পরামর্শ প্রদান এবং গ্রহণ করা ইত্যাদি তাঁর বিপুল কাজকর্মের অন্যতম দিক।

বিগত ৬২ বছরের ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে একথা বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পালাবদলের সূত্রে রাজ্যপাল তাঁর বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার করে সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বতন্ত্র উদাহরণ তৈরির চেষ্টা করলেও রাজ্যরাজনীতি তথা প্রকৃত শাসনের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীই মূল ক্ষমতার অধিকারী। তবে সমগ্র ভারতে সব রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর চেহারা এক রকম নয়। রাজ্য আইনসভায় রাজনৈতিক দলগুলির চেহারা, রাজনৈতিক দলের সদস্যদের উপর মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা তাঁর দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্ব—এই সব কিছুর সমন্বয়েই মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা নির্ভর করে।

১০.৯ সারাংশ

ভারতের সংবিধানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনা করা হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই একই রীতি মানা হয়েছে। রাজ্যস্তরে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেন রাজ্যপাল। তাঁর নামেই রাজ্যের প্রশাসন চলে। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে শাসনতান্ত্রিক, আইনগত, অর্থসংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিশেষ কিছু ক্ষমতা যাকে বলা হয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা।

রাজ্যপালের নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা সম্পর্কে যাই বিতর্ক হোক, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে প্রকৃত শাসক এবং তিনিই যে তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়ে রাজ্যের শাসনপরিচালনা করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে বিরোধ বিতর্ক যেমন চলে, তেমনি এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিমানসের অভিঘাতের উপরেই নির্ভর করে রাজ্যস্তরে প্রশাসনিক সঙ্কট কীভাবে সমাধান হবে।

১০.১০ অনুশীলনী

১। রাজ্যপালের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করুন।

২। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপালের কী কী ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ভোগ করেন?

৩। রাজ্যপালের 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট করুন।

৪। রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৬। রাজ্যের মন্ত্রীসভার গঠন সম্পর্কে আলোচনা কর।

১০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India.* Wadhawand Company, Nagpur, August 1999

২। নির্মলকান্তি ঘোষ : পূর্বোল্লিখিত

৩। সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র : পূর্বোল্লিখিত

৪। S. L. Sikri : *Indian Government and Politics* (1989)

৫। অনাদি কুমার মহাপাত্র : *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।

একক ১১ ❐ রাজ্যের আইনসভা

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ রাজ্য আইনসভার গঠন

১১.৪ রাজ্য আইনসভার কার্যাবলী

১১.৫ রাজ্য আইনসভার গুরুত্বপূর্ণ-পদাধিকারীবৃন্দ ও তাঁদের ভূমিকা।

অধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষ

বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতি

১১.৬ রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা,

১১.৭ রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

অর্থ বিল পাশের পদ্ধতি

১১.৮ রাজ্য আইনসভার অর্থ সংক্রান্ত কার্য পদ্ধতি

১১.৯ সারাংশ

১১.১০ অনুশীলনী

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

(ক) রাজ্যস্তরে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা কী রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

(খ) রাজ্য আইনসভা কীভাবে গঠন করা হয় তা স্পষ্ট হবে।

(গ) রাজ্যস্তরে আইন প্রণয়ন বিভাগে কারা সদস্য হতে পারেন সে সম্পর্কে জানা যাবে।

(ঘ) রাজ্য আইনসভার পরিচালনা কে করেন এবং তাঁর হাতে কী ক্ষমতা থাকে তাও জানা যাবে।

(ঙ) আইনসভার কার্যপদ্ধতির ধারা সম্পর্কে বোঝা যাবে।

১১.২ প্রস্তাবনা

ভারতের সংবিধানে যেহেতু দ্বিবিধ শাসনব্যবস্থা রয়েছে, তাই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় যেমন দেখা যায়, রাজ্যের শাসনস্তরেও আইন প্রণয়ন করার জন্য একটি আইনসভার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আইনসভা সেই সকল বিষয় নিয়ে আইন প্রণয়ন করে যেগুলি রাজ্য তালিকাভুক্ত। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির যেসব ক্ষেত্রগুলি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত সেগুলিও আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। একথা প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের সব কটি অঙ্গরাজ্যের গঠন একরকম নয়। অধিকাংশ আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট হলেও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হলেও আইনসভাও কোন কোন অঙ্গরাজ্যে রয়েছে। সদস্যসংখ্যাও অঙ্গরাজ্যের আয়তনভেদে বিভিন্ন প্রকার। তবে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই অঙ্গরাজ্যগুলির সব আইনসভাতেই একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ। সুতরাং কেন্দ্রীয় স্তরে যেমন রাজ্যস্তরেও আইন প্রণয়ন হয় এক গণতান্ত্রিক বাতাবরণের ভিতর। অঙ্গরাজ্যগুলির বিশেষ ও স্থানীয় আর্থসামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে সাংবিধানিক আইনকাঠামোর ভিতরে থেকে রাজ্য আইনসভাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। বিশেষত, দেশে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনগত ভারসাম্য রাখতে এবং রাজ্যগুলিকে আর্থসামাজিক দিক থেকে যতটা সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভাসমূহের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়।

বর্তমান আলোচনায় অঙ্গরাজ্যের আইনসভাগুলির গঠন, কার্যাবলী, কার্যপদ্ধতি, আইনসভার সদস্যদের দায়দায়িত্ব, যোগ্যতা, আইনসভার অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিদের কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ভিতর দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে, কীভাবে অঙ্গরাজ্যের আইনসভাসমূহ সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার ভিতর নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

১১.৩ রাজ্য আইনসভার গঠন

অঙ্গরাজ্যগুলির গঠন সংবিধান অনুসারে যদিও একই রকম হওয়া উচিত, তবুও রাজ্যভেদে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার গঠন এবং আকার ভিন্ন। সংবিধানের ১৬৮ ধারা অনুসারে, প্রতিটি রাজ্যেই রাজ্যপাল আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যদিও তিনি আইনসভার সদস্য নন। কতকগুলি রাজ্যের আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। তবে অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভাই এক কক্ষ বিশিষ্ট। এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে সংবিধানের ভাষায় বলা হয় বিধানসভা। যেসব অঙ্গরাজ্যে দ্বিতীয় কক্ষ রয়েছে, সেই দ্বিতীয় কক্ষকে বলা হয় বিধানপরিষদ। সাংবিধানিক পরিভাষায় বিধানসভাকে নিম্নকক্ষ এবং বিধানপরিষদকে উচ্চকক্ষ বলেও বর্ণনা করা হয়।

অঙ্গরাজ্যগুলির কোনগুলিতে দুটি কক্ষ থাকবে সে সম্পর্কে সংবিধানের ১৬৯ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ যদি কোন রাজ্যের বিধানসভায় মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে ওই রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন বা লোপ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তবে সংসদ

ওই রাজ্যে সেইমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই পদ্ধতি মেনে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন এবং লোপ করার মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত বিহার, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ এবং জম্মুকাশ্মীর এই পাঁচটি রাজ্যে বিধান পরিষদ বহাল আছে। অনাবশ্যক এবং ব্যয়বহুল এই দুই যুক্তি উত্থাপন করে দ্বিতীয় কক্ষের অস্তিত্ব লোপ করার কথা অনেক সময়ই আলোচিত হয়। তবে সে আলোচনার আগে আমরা অন্যান্য কয়েকটি প্রসঙ্গ একে একে উত্থাপন করব।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্য আইনসভার নিম্নকক্ষে অর্থাৎ বিধানসভায় প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন। ৬১তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে ভোটাধিকারের বয়স ১৮ করা হয়েছে। এর আগে ন্যূনতম বয়স ২১ বছরে নির্দিষ্ট ছিল। কোন রাজ্যে কতজন প্রতিনিধি বিধানসভায় পাঠানো হবে তা নির্ধারণ করা হয় জনসংখ্যার অনুপাতে। সেইভাবে অঙ্গরাজ্যগুলিকে কয়েকটি ভৌগোলিক নির্বাচন এলাকায় ভাগ করা হয়। জনসংখ্যা অনুপাতে নির্বাচন কেন্দ্র স্থির করার সূত্র সারা দেশে যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। প্রত্যেক জনগণনার পর ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস করার কথা বলা হয়েছে। তবে রাজ্যের বিধানসভার সদস্যসংখ্যা সাধারণভাবে ৫০০-র বেশি এবং ৬০-এর কম হতে পারে না। তবে কয়েকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৬০ এর কম হবে তাও বলা হয়েছে। বিধানসভায় প্রয়োজন মনে করলে রাজ্যপাল যে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারেন তাও ৩৩৩ ধারায় বলা হয়েছে। বিধানসভার সদস্যদের ভিতর থেকে একজন বিধানসভার অধ্যক্ষ (স্পীকার) ও একজন উপাধ্যক্ষ (ডেপুটি স্পীকার) হিসাবে নির্বাচিত হন। বিধানসভার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এই দুটি পদের প্রয়োজনীয়তা।

যে সব রাজ্যে বিধান পরিষদের অস্তিত্ব আছে, সেইসব কক্ষের গঠন সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব।

বিধান পরিষদ বা উচ্চ কক্ষের সদস্যসংখ্যা ৪০-র কম এবং বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারে না। বিধান পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন বিভিন্ন উপায়ে।

(ক) এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি সদস্যরা আসেন পুরসভা, জেলা বোর্ড এবং সংসদ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে।

(খ) এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি সদস্যরা নির্বাচিত হন বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা।

(গ) এক-দ্বাদশাংশ নির্বাচিত হন স্নাতকদের দ্বারা।

(ঘ) এক-দ্বাদশাংশ নির্বাচিত হন শিক্ষকদের দ্বারা।

(ঙ) বাকী সদস্যদের নির্বাচিত করেন রাজ্যপাল। তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবী যাঁরা চারুকলা, সমাজসেবা, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ, তাঁদের মনোনীত করেন। তবে এক্ষেত্রেও রাজ্যপাল মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শমতো কাজ করেন।

রাজ্যের আইনসভার নিম্নকক্ষের মতো উচ্চকক্ষকেও পরিচালনা করার জন্য সদস্যদের ভিতর থেকে

একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নিযুক্ত হয়ে থাকেন। রাজ্য আইনসভার নিজস্ব সচিবালয় থাকবে। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকলে উভয় কক্ষেরই আলাদা সচিবালয় এবং সুনির্দিষ্ট কর্মী থাকবেন (১৮৭ ধারা)।

আইনসভার সদস্য হবার যোগ্যতা প্রসঙ্গে সংবিধান কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যেমন ঃ

(ক) তিনি ভারতের নাগরিক হবেন।

(খ) বিধানসভার ক্ষেত্রে ২৫ বছর এবং বিধান পরিষদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর বয়স হতে হবে।

(গ) সংসদের বিধান কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা।

এছাড়া কোন ব্যক্তি আদালত কর্তৃক অসুস্থ মস্তিষ্ক বলে ঘোষিত হন বা তাঁকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হয়, সেক্ষেত্রেও তিনি আইনসভার সদস্য হবার যোগ্যতা হারাবেন। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনও তাঁকে সদস্য হবার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করবে। সর্বোপরি ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোনও লাভজনক পদ গ্রহণ করলেও তিনি আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না।

আইনসভার কোন সদস্য যদি তাঁর সদস্যপদ ত্যাগ করতে চান সেক্ষেত্রে তাঁকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। বিধানসভার ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ-র কাছে এবং বিধান পরিষদের ক্ষেত্রে পরিষদের সভাপতির কাছে এই চিঠি পেশ করতে হবে। তবে ৩৩তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে সভাপতি বা অধ্যক্ষ অনুসন্ধান করে দেখবেন যে ওই পদত্যাগপত্র স্বেচ্ছাকৃত বা প্রকৃত কিনা। পদত্যাগপত্র স্বেচ্ছাকৃত না হলে পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে না। এছাড়া ৫২ তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে কোন সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দলবিরোধী আইন অনুসারে হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

বিধানসভার মেয়াদ সাধারণত পাঁচ বছর। প্রয়োজন হলে কার্যকাল উত্তীর্ণ হবার আগে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া যায়। আবার জরুরী অবস্থা ঘোষণা হলে রাষ্ট্রপতি এর সময়কাল প্রতিবার এক বছর করে বাড়িয়ে দিতে পারেন (১৭২/১ ধারা)।

বিধানসভা ও বিধান পরিষদ উভয়ের ক্ষেত্রেই সভা শুরুর জন্য সদস্যসংখ্যার, এক দশমাংশের উপস্থিতি বা ১০ জন সদস্য যে সংখ্যাটি বেশি, অন্ততপক্ষে প্রয়োজন।

১১.৪ রাজ্য আইনসভার কার্যাবলী

আমরা এর আগেই দেখেছি যে ২৯টি রাজ্য আইনসভার মধ্যে মাত্র পাঁচটি রাজ্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। বাকী ২৪টি অঙ্গরাজ্যের আইনসভাগুলি এক কক্ষ বিশিষ্ট। সুতরাং এই পাঁচটি আইনসভা বাদে বাকী সকল এককক্ষবিশিষ্ট অঙ্গরাজ্যের আইনসভা অর্থাৎ বিধানসভাগুলিই আইনসভার যাবতীয় কাজ করে থাকে। স্বভাবত এই সকল ক্ষেত্রে আইনসভার কর্মপ্রক্রিয়া অনেক সহজ। যেসব আইনসভায় বিধান পরিষদ রয়েছে, সেখানে কর্মপ্রক্রিয়া

অপেক্ষাকৃত জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। রাজ্য আইনসভার দায়িত্ব মূলত তিন প্রকার। (ক) আইন প্রণয়ন (খ) অর্থ বিষয়ক কাজ ও (গ) শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ।

ক. আইন প্রণয়ন

সংবিধান অনুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত ৬৬টি বিষয় সম্পর্কে রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে। এছাড়াও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিও রাজ্য আইনসভার এক্তিয়ারভুক্ত। সাধারণ আইন পাস করার জন্য রাজ্য আইনসভার উভয় কক্ষ (যদি থাকে) এবং রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে বিধানসভার ক্ষমতা বেশি। যদি উভয় কক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয়, বিধানসভার ইচ্ছাই সেখানে চূড়ান্ত। ১৯৭ ধারায় এ সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়া আছে। বলা হয়েছে, উভয় কক্ষের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট বিল নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহলে যদিও বিধান পরিষদ বিলটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, সংশোধন করতে পারে এমনকি তিন মাসের জন্য বিলটি ধরেও রাখতে পারে, কিন্তু এরপরেও যদি বিলটি বিধান পরিষদে আবার উত্থাপিত হয়, সেক্ষেত্রে বিধান পরিষদের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। বড়জোর একমাস পর্যন্ত পরিষদে বিলটি আটকে রাখা যেতে পারে। এই সময় অতিবাহিত হলে বিলটি পাস হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে বিলটি আইনে পরিণত হতে আর কোনও অসুবিধা থাকবে না। সুতরাং কোন বিল আইনে পরিণত হতে গেলে বড় জোর চার মাস পর্যন্ত বিধান পরিষদ আটকে রাখতে পারে। দুটি কক্ষে পাস হলে বিলটি রাজ্যপালের সম্মতির জন্য যায়। আমরা পূর্ববর্তী একাকে দেখেছি এক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিলটিকে সম্মতি না দিয়ে আবার বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে বা রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন। তবে রাজ্যপাল যদি বিধানসভায় বিলটি ফেরত পাঠান এবং পুনর্বিবেচিত হয়ে যদি তা রাজ্যপালের কাছে আবার ফিরে আসে, সেক্ষেত্রে রাজ্যপালের সম্মতি বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া মেনে নির্দিষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

তবে রাজ্য আইনসভার হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকলেও সংবিধানের বিভিন্ন ধারা বিচার করলে বোঝা যায় যে রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়নের সুযোগ নানান নিয়মের দ্বারা বাঁধা। যেমন, রাজ্য আইন যদি কোনও কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী হয়ে পড়ে, তাহলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ হবে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যপাল যদি কোনও আইনে সম্মতি না জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে মতামতের জন্য পাঠান এবং রাষ্ট্রপতি সেক্ষেত্রে অনুমোদন না দেন, সেই বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। তৃতীয়ত, দুই বা ততোধিক রাজ্য যদি মনে করে যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে সংসদকে অনুরোধ করবে, সেক্ষেত্রে সংসদের হাতে ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা চলে যায়। চতুর্থত, যদি সংসদ মনে করে জাতীয় স্বার্থে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে রাজ্যের হাতে আইন তৈরির ভার না দিয়ে সংসদের নিজের হাতে নেওয়া উচিত, সেক্ষেত্রে বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত হলেও তা আর রাজ্যের হাতে থাকবে না। সর্বোপরি সাংবিধানিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে সংসদ কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করতেই পারে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্গরাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় প্রাধান্য থাকার ফলে অঙ্গরাজ্যের আইনসভা অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েন।

সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মানা হয়, অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট এবং মৌলিক। যেমন, অর্থবিল বিধান পরিষদে উত্থাপিত হবে না। দ্বিতীয়ত, বিধান পরিষদ অর্থবিলের উপর কিছু প্রস্তাব দিলেও কোনও সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। তৃতীয়ত, বিধান পরিষদ যদি অর্থবিল পাস না করে বা ১৪ দিনের মধ্যে বিধানসভায় ফেরত না পাঠায়, সেক্ষেত্রেও আইনসভা বিলটিকে পাস হয়েছে ধরে নিয়ে রাজ্যপালের কাছে অনুমতির জন্য পাঠাবে।

এই আলোচনা থেকে একথা মোটামুটি স্পষ্ট যে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধান পরিষদের ক্ষমতা একেবারেই গৌণ। তাছাড়া বিধানসভার ক্ষমতাও অনেকটাই সীমিত।

খ. অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধান অনুসারে রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাজ্যবিধানমণ্ডলীর হাতে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিধানসভার অনুমোদন ব্যতীত রাজ্য সরকার কর ধার্য, সংগ্রহ বা কোনরকম অর্থব্যয় করতে পারে না। এর আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে অর্থবিল কেবল বিধানসভাতেই উত্থাপন করা যায়। এমনকি বিধানসভা থেকে পাঠানো অর্থবিল ১৪ দিনের বেশি বিধানপরিষদ আটকে রাখতে পারে না। রাজ্যপালের সম্মতি পেলে অর্থবিল আইনে পরিণত হয়। এছাড়া সরকারি ব্যয়মঞ্জুরীর ক্ষেত্রেও বিধানসভার ক্ষমতা অনন্য। রাজ্য বিধানসভা যে অর্থ ব্যয় করার জন্য মঞ্জুর করেন, সেই অর্থ মন্ত্রীসভা যথাযথ ব্যয় করছেন কিনা বিধানসভাকে তাও পর্যালোচনা করে দেখতে হয়।

তবে রাজ্য বিধানসভার অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতারও সীমাবদ্ধতা আছে। কিছু ব্যয় আছে যা এর অনুমোদন সাপেক্ষ নয়। আবার রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যয়বরাদ্দের দাবি বিধানসভায় উত্থাপন করা যায় না। কর ধার্য করা বা আদায়কৃত করের কোন অংশ রাজ্য পাবে এ সব কিছুই সংবিধান নিয়ন্ত্রিত এবং কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্ক আলোচনার সময় (প্রথম এককে) আপনারা দেখেছেন এ সব ক্ষমতাই কেন্দ্রের হাতে দেওয়া আছে। এমনকি করের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট ক্ষমতাও কেন্দ্রের হাতে। জরুরী অবস্থার সময়, আর্থিক ক্ষমতাও কেন্দ্রের হাতে থাকে+ সুতরাং আইনসভার হাতে অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাও সীমিত।

গ. শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ

রাজ্য আইনসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। সংবিধানে স্পষ্টত বলা আছে যে মন্ত্রীসভা যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। সুতরাং রাজ্য আইনসভা যতদিন পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকে, মন্ত্রীসভার স্থায়িত্বও ততোদিনই থাকে। মন্ত্রীর কাছে সংশ্লিষ্ট দফতর নিয়ে প্রশ্ন করা, রাজ্য প্রশাসনের কোন কাজে গাফিলতি দেখলে তার সমালোচনা করা এবং জবাবদিহি চাওয়া ইত্যাদি নানানভাবে বিধানসভা সর্বদা রাজ্যপ্রশাসনকে চাপের মধ্যে রাখে। বিশেষত বিরোধী দলের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিধানসভার বিতর্ক, মুলতুবি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদি মন্ত্রীমণ্ডলী তথা শাসনবিভাগকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। এমনকি কোনসময় মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এলে অধ্যক্ষর অনুমতিসাপেক্ষে ভোট নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যদি অনাস্থা প্রস্তাবের সপক্ষে বেশি ভোট পড়ে, তাহলে মন্ত্রীসভার পতনও ঘটতে পারে। তবে বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় এই ধরনের সম্ভাবনা আপাতভাবে না

থাকলেও যেভাবে জোটরাজনীতি ক্রমবর্ধমান, সেখানে শরিক দলগুলি তুচ্ছ কোন কারণে সঙ্গ ত্যাগ করলেই এই চিত্র বদলে যেতে পারে। কাজেই মন্ত্রীসভাকেও সব সময়ই বিধানসভার সমর্থন রাখার জন্য বিভিন্ন শরিক এবং দলের অভ্যন্তরীণ উপদলগুলির মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলতে হয়।

ঘ. রাজ্য আইনসভার অন্যান্য কাজ

আলোচিত তিনটি বিষয় ছাড়া আরও কিছু কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় আইনসভার উপর বর্তায়।

প্রথমত, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের ভূমিকা মুখ্য হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার গুরুত্ব যথেষ্ট। ৩৬৮ ধারায় এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে যেগুলির ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয়সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন ছাড়াও রাজ্য বিধানসভাগুলির অন্তত অর্ধেকের সমর্থন প্রয়োজন। এই সব বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট সম্পর্কিত কিছু ক্ষেত্র এবং কেন্দ্র-রাজ্য সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার জন্য যে নির্বাচক সংস্থা গঠন করা হয়, বিধানসভার সদস্যরা সেই নির্বাচক সংস্থার সদস্য হন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিধানসভার বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে।

তৃতীয়ত, রাজ্যসভায় যাঁরা সদস্য হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাঁদের নির্বাচন করেন বিধানসভার সদস্যরা।

চতুর্থত, রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যেমন, রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের বার্ষিক প্রতিবেদনে পেশ করা হয়। বিধানসভার সদস্যরা সেই বিষয়ে বিধানসভায় মতামত দিয়ে থাকেন।

পঞ্চমত, রাজ্যের আইনসভায় যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, বিরোধ বিতর্ক চলে বা আইনসভার সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, সেগুলি সংবাদপত্র বা অন্যান্য প্রচারমাধ্যম মারফত জনমানসে ছাপ ফেলে। এইভাবে কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে জনমতও গড়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক বাতাবরণের পক্ষে এই ধরনের আলাপ-আলোচনা সর্বদাই মঙ্গলজনক।

সর্বোপরি, রাজ্য বিধানসভার সদস্যরা নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনেই সভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করেন।

সংবিধানের বিভিন্ন ধারা পর্যবেক্ষণ করে আমরা শেষ পর্যন্ত একথা বলতে পারি যে বিধান পরিষদের অস্তিত্ব তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বিধানসভা তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যথাসম্ভব দায়িত্ব পালন করে থাকে। মন্ত্রীসভা যেহেতু বিধানসভার কাছে তাঁর সব কাজের জন্য দায়িত্বশীল থাকে এবং বিধানসভা যেহেতু গঠিত হয় সরাসরি জনগণের দ্বারা তাই আইনসভা সমগ্রভাবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। জনগণের প্রতি এই দায়বদ্ধতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে গণতন্ত্রের বীজ। তাই আইনসভা তা কেন্দ্র বা রাজ্য যে স্তরেরই হোক না কেন, তার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

১১.৫ রাজ্য আইনসভার গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী বৃন্দ ঃ কার্যাবলী ও ভূমিকা

রাজ্য আইনসভা পরিচালনা করার জন্য কয়েকজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পদাধিকারীর সৃষ্টি করা হয়েছে। বিধানসভার সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে সভার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন সভা পরিচালককে মনোনীত করেন। তিনি অধ্যক্ষ বা স্পীকার নামে পরিচিত হন। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে বিধানসভায় অধ্যক্ষের যাবতীয় দায়দায়িত্ব যিনি পালন করেন, তিনি উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি স্পীকার। অনুরূপভাবে বিধান পরিষদের পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হন সভাপতি বা চেয়ারম্যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা করেন বিধান পরিষদের সহসভাপতি। এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেন।

অধ্যক্ষ

বিধানসভার পরিচালক হিসাবে অধ্যক্ষের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সভার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে যাতে পরিচালিত হয়, সেটা দেখাই অধ্যক্ষের কাজ। সুতরাং নতুন বিধানসভা গঠিত হলেই তার অধ্যক্ষ নির্বাচনের কাজ যথাসম্ভব দ্রুত সেরে ফেলতে হয়। তাই বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের কাজটি করা হয়। এই নির্বাচন ঘটে ভোটের মাধ্যমে। তাই সঙ্গতভাবেই যে দল বা জোট সরকার গড়েন, সেই পক্ষের কোন সদস্যকেই অধ্যক্ষের পদে নির্বাচনের জন্য পাঠানো হয়। এবং তিনিই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ সরকার যাঁরা গড়েন, অধ্যক্ষ সেই দলের বা জোটের টিকিটে নির্বাচনে লড়াই করে সদস্যপদ লাভ করলেও অধ্যক্ষপদে আসীন হবার পর সভার সভাপতি হিসাবে এক নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার গুরুভার তাঁর ওপর বর্তায়। তাই এই জনপ্রিয় কক্ষের মর্যাদা ও সুনাম এই সব কিছুই অধ্যক্ষের দক্ষতা ও কর্মকুশলতার উপর নির্ভর করে।

বিধানসভার অধ্যক্ষের ভূমিকা যে খুবই দায়িত্বপূর্ণ তা তাঁর কাজকর্ম লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। বিশেষত, অধ্যক্ষ নিজে কোন বিশেষ এলাকার জনপ্রতিনিধি হয়ে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হয় তা দুরূহ। নিরপেক্ষতার প্রশ্ন সংবিধানে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রথমত, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বেতনও ভাতা রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, বিধানসভার তর্কবিতর্কে তিনি অংশগ্রহণ করেন না। তৃতীয়ত, কোন বিষয়ে বিধানসভায় যদি ভোট হয়, সেক্ষেত্রে তিনি ভোটদান করেন না। তবে পক্ষে ও বিপক্ষে যদি সমসংখ্যক ভোট পড়ে, সেক্ষেত্রে কেবল সমাধান করার জন্য তিনি ভোট দেবেন। চতুর্থত, অধ্যক্ষের অপসারণের কোন প্রস্তাব সভায় বিবেচিত হলে অধ্যক্ষ সেই সভার সভাপতি থাকেন না। সেক্ষেত্রে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বা অন্য কোন সদস্য কাজ পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য অধ্যক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাব সম্পর্কে সভায় বক্তব্য রাখতে পারেন। পঞ্চমত, অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হবার পর যতদিন বিধানসভার মেয়াদ থাকে, তিনি তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তবে তিনি ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারেন। তাঁকে অপসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ১৪ দিনের নোটিশ দিয়ে বিধানসভার সদস্যদের এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়।

তবে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সংবিধানে এই সব নির্দেশ দেওয়া হলেও বিভিন্ন সময় নানান রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষগণ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে চিহ্নিত হয়েছেন। যেমন ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিজয় সিং নাহার, ১৯৬৮ সালে পাঞ্জাব বিধানসভায় যোগীন্দর সিং মান, ১৯৭১ সালে তামিলনাড়ুতে মাথিয়ালগনের কার্যকলাপ। আবার ১৯৮৩ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষ ওয়ালি মহম্মদ ইটোকে জোর করে তাঁর পদ থেকে অপসারণ সংসদীয় প্রথার বিরোধী ছবিই আমাদের সামনে তুলে ধরে। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষ কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর পক্ষপাতপূর্ণ আচরণও সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর বিরাট আঘাত। কোন কোন সময় রাজ্যের অধ্যক্ষ যে আবার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন না তার উদাহরণও আছে। যেমন ১৯৮২ সালে কেরল ইউ ডি এফ মন্ত্রীসভা রক্ষা পায় অধ্যক্ষের নির্ণায়ক ভোটের ফলে যা রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তোলপাড় করে।

নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে যিনি অধিষ্ঠিত হন, তাঁকে নানান দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাঁর দায়দায়িত্ব সবই লোকসভার অধ্যক্ষের সমতুল। তবে উভয়ের কার্যক্ষেত্র ভিন্ন। বিধানসভার অধ্যক্ষের কার্যাবলী আমরা কয়েকটি ভাগে আলোচনা করতে পারি।

(ক) বিধানসভার অধিবেশনগুলির সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ। সভায় আলোচনা, বিতর্ক ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অধ্যক্ষের মূল কাজ। সভায় যাতে সংসদীয় রীতিনীতি মেনে আলোচনা হয়, প্রত্যেক সদস্য বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেদিকে অধ্যক্ষ লক্ষ্য রাখেন। কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সংখ্যালঘু অংশের মতামতও যাতে সমান গুরুত্ব পায় সেদিকে তাঁর সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হয়। সভার কাজে যাতে কোনরকম বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে তাঁর নজরদারি রাখতে হয়। এইসব দিক খেয়াল রাখতে গিয়ে অধ্যক্ষকে অনেক সময়ই অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হয় যেমন, কোন সদস্য যদি অশালীন মন্তব্য বা অসংসদীয় কথাবার্তা বলেন সেক্ষেত্রে তাঁকে সতর্ক করা এমনকি সভা থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তও তাঁকে নিতে হতে পারে। কোন সদস্য যদি ক্রমাগত সভার কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন বা অধ্যক্ষের বারণ না মানেন, সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষ সভার বাকী সময়ের জন্য সদস্যদের নামোল্লেখ করতে পারেন। অর্থাৎ ঐ সদস্য আর অধিবেশন চলাকালীন সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না। বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে মনে করলে তিনি অধিবেশন মুলতুবি রাখতে পারেন।

(খ) বিধানসভার কার্যক্রম স্থির করার দায়িত্ব অধ্যক্ষের। বিধানসভার আলোচ্য বিষয় স্থির করা, বক্তৃতার সময় নির্দিষ্ট করা, যে কোন প্রশ্নের বা প্রস্তাবের বৈধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা তাঁরই উপর। অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন বিলের সংশোধনী প্রস্তাব বা বিলটি গ্রহণ না করার প্রস্তাব বিধানসভায় আনা যায় না। কোন বিরোধ বিতর্কের নিষ্পত্তি করার জন্য ভোট নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা এবং থাকলে তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত। সভায় বক্তৃতা চলাকালীন সদস্য বক্তার বক্তব্য যদি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় তাহলে সে আলোচনা বন্ধ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

(গ) কোনও বিল বিধানসভায় পেশ করার আগে তা অর্থবিল কিনা সে ছাড়পত্র দেন অধ্যক্ষ স্বয়ং (১৯৯ (৩) ধারা)। ১৯৯(৪) ধারা অনুসারে বিধান পরিষদে পাঠানোর সুযোগ থাকলে বা রাজ্যপালের

কাছে সম্মতি চাইবার জন্য পাঠাতে হলে অধ্যক্ষকে প্রত্যেক অর্থবিল সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

(ঘ) কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা যদি বিধানসভার অবমাননা করেন, তাহলে বিধানসভার তরফ থেকে অধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে শাস্তি দিতে পারেন।

(ঙ) রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষার দায়িত্বও অধ্যক্ষের উপর। সদস্যদের বিশেষ অধিকারগুলি যাতে তাঁরা ভোগ করতে পারেন, সে দিকে অধ্যক্ষ বিশেষভাবে নজর রাখেন।

(চ) কোনও ব্যক্তি কোন দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হবার পর যদি দলত্যাগ করেন বা দল থেকে বহিষ্কৃত হন, তাহলে দলবিরোধী আইন অনুসারে তাঁকে দলত্যাগী বলা যাবে কিনা সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরী। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপর নির্ভর করে ঐ বিশেষ ব্যক্তি বিধানসভার সদস্য হিসাবে অধিকারগুলি ভোগ করতে পারেন কিনা। সংবিধানের ৫২তম সংশোধন অনুসারে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ স্বয়ং।

(ছ) সংসদীয় রীতি অনুসারে বিধানসভার বিভিন্ন কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখার জন্য বিধানসভার অনেকগুলি কমিটি তৈরি করা হয়। যেমন, আবেদন কমিটি, অধিকার সংক্রান্ত কমিটি, সভার কাজ পরিচালনার জন্য পরামর্শদান কমিটি ইত্যাদি। এইসব কমিটি তৈরি এবং এইসব কমিটির সভাপতিগণ অধ্যক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন। এইসব কমিটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁরই উপর থাকে।

(জ) বিধানসভার সঙ্গে রাজ্যপালের সংযোগের মাধ্যম হলেন অধ্যক্ষ। রাজ্যপাল বিধানসভায় কোন বিশেষ কারণে বাণী পাঠালে অধ্যক্ষ তা পাঠ করে বিধানসভার সদস্যদের শোনান।

বিধানসভার অধ্যক্ষের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে রাজ্যরাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে তাঁর ভূমিকা কতোটা স্পর্শকাতর। দলমত নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা না পেলে অধ্যক্ষের পক্ষে নিরপেক্ষ থেকে তাঁর গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। তাঁর কার্যাবলীই প্রমাণ করে যে তাঁর স্থান দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে। অথচ তিনি প্রাথমিকভাবে তিনি বিধানসভার সদস্যপদ লাভ করেন কোনও একটি রাজনৈতিক দলের টিকিটে। আবার সংসদীয় রীতি অনুসারে তাঁর নির্বাচন যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতার সূত্র ধরে, তাই তাঁর নির্বাচন যে ক্ষমতাসীন দলের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে তা বলা যায়। তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিধানসভায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিরোধী দল বারবার অনাস্থা প্রস্তাব আনলেও এই অনাস্থা প্রস্তাব কোন সময়েই পাস করানো যায়নি সংখ্যার কারণে। বিধানসভার অধ্যক্ষের পদটিকে এই রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তোলা কোন সময়ই সম্ভব হয়নি। বস্তুত বিধানসভা তথা লোকসভার অধ্যক্ষের পদটিকে দলীয় রাজনীতি বিমুক্ত করে তোলার চেষ্টা সেভাবে এখনও হয়নি যা অনিবার্যভাবে প্রয়োজন।

উপাধ্যক্ষ

অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষের কাজ চালাবার জন্য উপাধ্যক্ষ পদের সৃষ্টি। তাঁর বেতন, সুযোগ সুবিধা সবই অধ্যক্ষের অনুসারী। কোন কারণে যদি পদত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে তিনি উপাধ্যক্ষকে সম্বোধন করে লিখে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। তাঁর কাজের স্থায়িত্বও বিধানসভার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত।

বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতি

বিধান পরিষদের সভাপতির কাজ মুখ্যত বিধানসভার অধ্যক্ষের মতোই। তবে যেহেতু বিধান পরিষদের ক্ষমতা বিধানসভার ক্ষমতার থেকে অনেকাংশ কম তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর ক্ষমতাও সুনির্দিষ্ট এবং অনেকটাই সীমিত। বিধান পরিষদের সহসভাপতির কাজ বিধানসভার উপাধ্যক্ষর মতোই। তবে এ ক্ষেত্রেও সহসভাপতির কাজকর্মও সীমিত ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতির মেয়াদও সুনির্দিষ্ট সময়ের পর উত্তরসূরি নির্বাচন পর্যন্ত বহাল থাকে। তাঁদের অপসারণও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এবং এক্ষেত্রেও ১৪ দিনের নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

১১.৬ রাজ্য আইনসভার সদস্যদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার

ব্যক্তিগতভাবে বেতন, ভাতা ইত্যাদি যেমন সংবিধানে বিধায়কদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তেমনি আইনসভা ও তার সদস্যদের জন্য কিছু সুযোগসুবিধাও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যেগুলি ছাড়া আইনসভার সদস্যরা তাঁদের দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন না। এইসব সুযোগসুবিধা আইনসভার সদস্যদের বিশেষাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই বিশেষাধিকার দু ধরনের। এর মধ্যে কিছু অধিকার আছে যা প্রতিটি সদস্য ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করেন। এছাড়াও রয়েছে আরও কিছু অধিকার যা সদস্যরা সমবেতভাবে ভোগ করেন। ভারতীয় সংবিধানের ১৯৪ ধারায় রাজ্য আইনসভা ও তার সদস্যদের এইসব বিশেষাধিকার সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে।

এই ধারা অনুসারে, রাজ্য আইনসভার সদস্যদের মূলত দুটি অধিকার দেওয়া হয়েছে ঃ

(ক) বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার ও (খ) কাগজপত্র প্রকাশের অধিকার। উভয় ক্ষেত্রেই আইনসভার সদস্যরা আদালতে অভিযুক্ত হবেন না। তবে এই অধিকার দুটি প্রয়োগ করতে গিয়ে কোন সদস্য যদি আইনসভার নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাহলে অধ্যক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ আইনসভার নিয়ম মেনে তিনি আইনসভার অভ্যন্তরে বাক্‌স্বাধীনতা ভোগ করবেন। যদি আইনসভার অভ্যন্তরে কোন সদস্য অন্য কোন সদস্যর বিরুদ্ধে মর্যাদা হানিকর কোন মন্তব্য করেন, সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষ সেই সদস্যর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনও শাস্তি নির্দিষ্ট করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, রাজ্য আইনসভার কাজকর্ম সম্পর্কিত রিপোর্ট বা কাগজপত্র প্রকাশ করার স্বাধীনতা সদস্যদের আছে। কিন্তু এই অধিকার অবাধ নয়। অধ্যক্ষ যদি বিতর্ক থেকে কোন অংশ বাদ দেন বা তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন অথচ কোন সদস্য যদি ঐ অংশ প্রকাশ করেন, সেক্ষেত্রে ঐ সদস্য আইনসভার অবমাননার দায়ে পড়বেন।

তৃতীয়ত, আইনসভার সদস্যরা অধিবেশনের ৪০ দিন আগে এবং অধিবেশন শেষ হবার ৪০ দিন পর পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু এই বিশেষাধিকার ফৌজদারি মামলা ও নিবর্তনমূলক

আটক আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেক্ষেত্রেও কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতিগত নিয়মের কথা বলা হয়েছে। যেমন (ক) আইনসভার সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতির অনুমতি ছাড়া আইনসভার সীমানার মধ্যে কোনও ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলার নোটিশ দেওয়া যায়। (খ) রাজ্য আইনসভার সীমানার মধ্যে কোন সদস্যকে গ্রেফতার করা যায় না। (গ) রাজ্য আইনসভার সদস্যদের গ্রেফতার করতে হলে অধ্যক্ষকে জানাতে হয়। (ঘ) কোন সদস্যকে গ্রেফতার করার পর মুক্তি দিলেও সেই সংবাদ অধ্যক্ষকে জানাতে হবে। (ঙ) আইনসভার অধিবেশন চলাকালীন কোন সদস্যকে আদালতে সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাকা যাবে না।

আইনসভার প্রতিটি কক্ষ বা তাঁর সদস্যরা যৌথভাবে কিছু সুযোগসুবিধা লাভ করেন। সমষ্টিগতভাবে যে সব অধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল ঃ

(ক) রাজ্য আইনসভার অভ্যন্তরে যে সব তর্কবিতর্ক হয় সেগুলি প্রকাশ করা বা না করার অধিকার আইনসভার প্রতিটি কক্ষেরই রয়েছে।

(খ) রাজ্য আইনসভার অধিবেশন চলাকালীন বহিরাগত দর্শকদের প্রবেশের অধিকার থাকলেও প্রয়োজনে তা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

(গ) রাজ্য আইনসভার অভ্যন্তরে যে সমস্ত আলোচনা করা হয়, তা আইনসভার সদস্যদের নিজস্ব এক্তিয়ার। আইনসভায় কীভাবে কাজ চলবে, কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে সেগুলি নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার অন্য কারও এমনকি আদালতেরও নেই।

(ঘ) রাজ্য আইনসভার প্রতিটি কক্ষ কোন সদস্য বা অন্য যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে যদি দেখা যায় ঐ ব্যক্তি তার অধিকার ভঙ্গ করেছে। অধিকার ভঙ্গের অর্থ সভার অবমাননা। এই ধরনের অবমাননার ঘটনা ঘটলে এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার জন্য বিশেষ কমিটি আছে। এই কমিটি তিন ধরনের শাস্তির কথা বলতে পারে। যেমন, (১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনসভায় হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া এবং তাকে তিরস্কার বা ভৎর্সনা করা (২) ঐ ব্যক্তিকে আইনসভায় হাজির হতে বাধ্য করা ও তীব্র ভৎর্সনা করা (৩) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো যদি অভিযোগ আরও তীব্র হয়।

আইনসভার এই সকল ব্যক্তিগত ও যৌথ অধিকারসমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়। আইনসভার মর্যাদা রক্ষার জন্য যেমন এইসব সুযোগসুবিধা থাকা দরকার, তেমনি এগুলি থাকার ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং জনসাধারণও তাঁদের আইনসভার কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা থাকে বিরত থাকতে পারে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে অনুকূল নয়। আইনসভার বিরুদ্ধে সমালোচনার অধিকার জনসাধারণের না থাকলে সমস্যা বাড়তে পারে। এই কারণেই ১৯৫৪ সালে ভারতের প্রেস কমিশন এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন তুলে, আইনসভার বিশেষাধিকার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার অভিমত দিয়েছে।

১১.৭ রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

আইনসভায় কোন আইন পাস করতে হলে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে। এইসব আইন কখনও বা পুরনো

আইন বাতিল করে, কখনও বা সংশোধন করে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের চাহিদা মেনে নতুন আইনকানুন তৈরিও করতে হয়। তাই সব আইনসভাতেই আইন প্রণয়নের কাজ সর্বদাই চলতে থাকে।

আমরা এর আগে রাজ্য আইনসভায় আইন প্রণয়নের বিষয় এবং পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছি। এখানে আইন প্রণয়নের জন্য যে বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

আইনসভায় যে আইন প্রণয়ন করা হয়, তা উপস্থাপিত করার জন্য একটি প্রাথমিক খসড়া করা হয়, এবং লিখিতভাবে তা পেশ করা হয়। এই লিখিত খসড়াটিকে বলা হয় বিল বা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে আইনে পরিণত হয়। এই বিল মূলত দুধরনের : সরকারি ও বেসরকারি বিল। সরকারি বিল বলতে বোঝায় সেইসব বিল যা কোন মন্ত্রী আইনসভায় উত্থাপন করেন।

অপরপক্ষে বেসরকারি বিল বলতে বোঝায় সে রাজ্য আইনসভার কোন সাধারণ সদস্য উত্থাপন করেন। এই সরকারি বিল আবার দু'ধরনের ঃ (ক) সাধারণ বিল এবং (খ) অর্থ বিল। সাধারণ বিল এবং অর্থ বিল বিধানসভায় পাস করার প্রক্রিয়া আলাদা। সংবিধান অনুসারে যে কোন সাধারণ বিল পাস করতে হলে ক্রমান্বয়ে সাতটি পর্যায় পেরোতে হয়। অর্থবিল পাসের ক্ষেত্রে অবশ্য পর্যায় সংখ্যা অনেক কম।

সংবিধান অনুসারে, অর্থবিল বা অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় বিল আইনসভার যে কোন কক্ষেই উত্থাপন করা যায়। কোন বিল রাজ্য আইনসভার দুটি কক্ষে (যদি থাকে) গৃহীত না হলে বিলটি আইনসভায় পাস হয়েছে বলে ধরা হবে না। এ ব্যাপারে সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন বিল অসিদ্ধ হবে কিনা সে সম্পর্কেও সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। বলা হয়েছে যে আইনসভার উপর কক্ষের অধিবেশন বন্ধ হওয়ার জন্য কোন বিবেচনাধীন বিল নাকচ হবে না। এছাড়া বিধানসভা পাস করেনি এমন কোন বিল বিধান পরিষদের বিবেচনাধীন থাকলে, বিধানসভা ভেঙে গেলেও তা বাতিল হবে না। কিন্তু যদি কোন বিল বিধানসভায় বিবেচনাধীন আছে, সেক্ষেত্রে বিধানসভা যদি ভেঙে যায়, সেই বিলও অসিদ্ধ বলে গণ্য হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে যদি কোন বিল রাজ্যপালের সম্মতির জন্য বিধানসভা থেকে পাঠানো হয় তাহলে সেই বিল বিধানসভায় ভেঙে গেলেও অসিদ্ধ হবে না।

অর্থবিল পাসের পদ্ধতি ঃ

বিধানসভা ছাড়া বিধান পরিষদে অর্থসংক্রান্ত কোন বিল উত্থাপন করা যায় না। দ্বিতীয়ত, রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া কোন অর্থ বিল বিধানসভায় উত্থাপন করা যাবে না। তৃতীয়ত, যেসব রাজ্যে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ আছে, সেখানে সুপারিশের জন্য অর্থ বিল যদিও পাঠাতে হয়, তবু বিধান পরিষদ সুপারিশ পাঠালেও অর্থ বিল সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করার কোন ক্ষমতা বিধান পরিষদের নেই। এই বিলটি বিধান পরিষদকে পাঠাতে হয় ১৪ দিনের মধ্যে। আর ঐ সময়ের মধ্যে না পাঠালে ধরে নিতে হবে যে বিলটি উভয় কক্ষের সম্মতি লাভ করেছে। চতুর্থত, বিধানসভাতে যে অর্থবিল গ্রহণ করা হবে সেই বিলটি অর্থবিল কিনা সে সম্পর্কে বিলটির যোগ্যতাপত্র দেবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ।

কোন বিল অর্থবিল সে সম্পর্কে অধ্যক্ষ যে যোগ্যতাপত্র দেন তার ভিত্তি সংবিধানের ১৯৯ ধারা। বলা

হয়েছে কোন করস্থাপন, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিল অর্থ বিল। এছাড়া রাজ্যসরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ বা গ্যারান্টি প্রদানের নিয়ন্ত্রণ অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বা গ্রহণীয় কোন আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কিত আইনের সংশোধন, রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল বা আকস্মিকতা তহবিলের জিম্মা, অর্থপ্রদান বা অর্থ উঠিয়ে নেওয়া, কোন ব্যয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য বলে ঘোষণা বা ব্যয়ের বৃদ্ধি এবং রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল বা সরকারি গণিতক খাতে অর্থপ্রাপ্তি ঃ এইসব বিষয়ের উপর আনীত বিল অর্থবিল বলে বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য, জরিমানা ব আর্থিক দণ্ড, লাইসেন্সের জন্য ফী বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন দর ধার্য, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন ইত্যাদি অর্থবিলের আওতায় পড়ে না।

১১.৮ রাজ্য আইনসভার অর্থসংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি

সংবিধানের ২০২ থেকে ২০৭ ধারায় রাজ্য আইনসভার অর্থসংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে রাজ্য আইনসভার উপর রাজ্যের অর্থসংক্রান্ত নানান সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে করধার্য বা বৃদ্ধির প্রস্তাব কেবল মন্ত্রীরাই করতে পারেন। তবে অন্যান্য সদস্যরা কোন কর কমাতে বা স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। সংবিধানে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে আইনসভার অনুমোদন ছাড়া কোন কর বসানো হবে না। রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে আইন ছাড়া সরকার কোন অর্থ তুলতে পারবে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে আইনের অনুমোদন দরকার। এছাড়া রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি করা যাবে না। এছাড়া আমরা এর আগেই দেখেছি যে অর্থসংক্রান্ত ব্যপারে কেবল বিধানসভার এক্তিয়ার রয়েছে।

সংবিধানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে রাজ্যপাল প্রত্যেক আর্থিক বছরের আয়ব্যয়ের হিসাব রাজ্য আইনসভায় উপস্থাপিত করার ব্যবস্থা করবেন। আয়ব্যয়ের এই বার্ষিক আনুমানিক হিসাব বা বাজেট রাজ্য আইনসভায় সাধারণত পেশ করেন অর্থমন্ত্রী। এই আনুমানিক ব্যয়ের দুটি অংশ আছে। (ক) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় এবং (খ) অনুমোদন সাপেক্ষ ব্যয়। সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলতে বোঝায় রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা এবং দপ্তরের জন্য অন্যান্য ব্যয় এবং এই অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সভাপতি, সহসভাপতির বেতন ও ভাতা, হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা, সরকারি ঋণজনিত ব্যয় ইত্যাদি। এছাড়া আইনসভা আইন করে যে কোন ব্যয়কে সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলে ঘোষণা করতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় প্রতি বছর বিধানসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। আইনসভায় অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করার পর বাজেটের সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। এই পর্বে বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম ও রাজ্যসরকারের নীতিসমূহ আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে সরকারি আয়ব্যয়ের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ আইনসভার পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়। তাই সরকারি আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইনসভাকে সহায়তা করার জন্য তিন ধরনের ব্যবস্থা হয়েছে। এগুলি হল (ক) ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক যার মূলকাজ আইনসভার পক্ষ থেকে সরকারি ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে দেখা এবং রাজ্যপালের কাছে সেই রিপোর্ট পেশ করা। রাজ্যপাল

আবার ঐ রিপোর্ট রাজ্য আইনসভায় পাঠিয়ে দেন। (খ) সরকারি গাণিতিক কমিটি যার প্রধান কাজ সরকারের বিনিয়োগে হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখা। এবং (গ) আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি যার মূল কাজ সরকারের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবের কাজে সাহায্য করা।

১১.৯ সারাংশ

ভারতের সংবিধানে রাজ্যস্তরে যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে রাজ্য আইনসভার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় রীতিনীতি মেনে নিয়মকানুন প্রবর্তনা করতে গিয়ে আইন পাস করার পদ্ধতি যথেষ্ট জটিল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠেছে। অর্থবিল পাস করার ক্ষেত্রে আবার কিছুটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। যেসব রাজ্যে আইনসভার দুটি কক্ষ থাকে, সেখানে আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

রাজ্য আইনসভার পরিচালনার দায়িত্ব অধ্যক্ষের। বিধানসভায় অধ্যক্ষের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হয়। অধ্যক্ষের যথাযথ ভূমিকা পালন কার্যপদ্ধতিকে সহজ ও সুন্দর করে তোলে।

১১.১০ অনুশীলনী

১। রাজ্য আইনসভার গঠন পদ্ধতি কী প্রকার?

২। রাজ্য আইনসভার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। বিধানসভায় অধ্যক্ষের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৪। রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি বিষয়ে কী কী ব্যবস্থা রয়েছে?

৫। অর্থবিল পাশের পদ্ধতি কী?

১১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India.* Wadhawand Company, Nagpur, August 1999.

২। নির্মলকান্তি ঘোষ : পূর্বোল্লিখিত

৩। সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র : পূর্বোল্লিখিত

৪। S. L. Sikri : *Indian Government and Politics* (1989)

৫। অনাদি কুমার মহাপাত্র : *ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।